পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার

এবং

রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, ২০২৩

প্রদান উপলক্ষ্যে

স্মা র ক গ্র ন্থ

২০২৪

সম্পাদনা

সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

সূচিপত্র

সম্পাদকের নিবেদন ॥ ৫

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : **সংক্ষিপ্ত জীবনী** ॥ ৭

হিন্দু বিবাহ সংস্কার ॥ **পদ্মনাথ ভট্টাচার্য** ॥ ৮

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস : **সংক্ষিপ্ত জীবনী** ॥ ১৩

ফ্রান্সে ভারতীয় ভূপর্যটক ॥ **রামনাথ বিশ্বাস** ॥ ১৪

অন্তরঙ্গ আলাপনের সংক্ষিপ্তসার ॥ ২৭

এ-যাবৎ প্রদত্ত স্মারক বক্তৃতার বিবরণ ॥ ৩০

স্মারকগ্রন্থ উন্মোচনকারী গুণীগণ ॥ ৩১

এ-যাবৎ পুরস্কৃত কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ॥ ৩২-৫৭

বানিয়াচঙের রাজবংশ : কুলপঞ্জি ॥ সংকলক : **রমানাথ ভট্টাচার্য** ॥ ৫৮

সম্পাদকের নিবেদন

এবারের স্মরকগ্রন্থে পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৮-১৯৩৮) 'হিন্দু বিবাহ সংস্কার' পুস্তিকাটি (গৌহাটি সনাতন ধর্মসভা থেকে সরকারী সম্পাদক রামদেব শর্মা কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ ১৩২১ বঙ্গাব্দ) সম্পূর্ণ মুদ্রিত হল। পুস্তিকাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এজন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ আছি।

ভূপর্যক রামনাথ বিশ্বাসের (১৮৯৪-১৯৫৫) 'ফ্রান্সে ভারতীয় ভূপর্যক' (প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরি কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৫৯, সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৮৮) থেকে দুটি অধ্যায় 'প্যারির পথে' ও 'পার্বত্য পথে' পৃ. ১-৩২) মুদ্রিত হল। আগামী বর্ষের স্মারকগ্রন্থে পরবর্তী তিনটি অধ্যায় 'মধ্য ফ্রান্সে', 'প্যারি', 'ফ্রান্স হতে বিদায়' (পৃ. ৩৩-৮৪) প্রকাশিত হবে।

পদ্মনাথ ও রামনাথের রচনা দুটির আগে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

এবছর পুরস্কার প্রাপ্ত দুজন কবি সহ এ-যাবৎ পুরস্কৃত মোট চব্বিশজন কবিরই সচিত্র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি স্মারকগ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

২০২৩ সালের জন্য দুই কবি জয় গোস্বামী ও দিলীপ ফুকনের পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমরা আনন্দিত। আমরা তাঁদের আনন্দ-উজ্জ্বল দীর্ঘ পরমায়ু কামনা করি।

আমার অগ্রজ প্রজ্ঞাবান সুকুমার বাগচি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মুম্বাই থেকে এই স্মারকগ্রন্থ প্রকাশে নিরন্তর উপাদান সংগ্রহ করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। এককথায় তিনি আমার কাজকে সবদিক থেকে সার্থক করেছেন। তাঁর এই অসাধ্য সাধনের বিনিময়ে প্রণামটুকু নিবেদন করি।

অসমের স্বারস্বত সমাজের কাছেও আমি বিনত ও প্রণত আছি। অধ্যাপক ড. উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ড. পান্নালাল গোস্বামী, অধ্যাপিকা ড. নন্দিতা ভট্টাচার্য গোস্বামী, অধ্যাপক ড. প্রসূন বর্মনের ক্ষমাসুন্দর অন্তর্দর্শনে আমি বিমুগ্ধ।

অবশেষে বেদনাদায়ক কথা হল রবীন্দ্র সরকার (৭.৮.১৯৪১-২.৯.২০২৩) এবং বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের (৩.১০.১৯৩৯-২৭.৯.২০২৩) মহাপ্রয়াণে এই প্রতিষ্ঠানের অপূরণীয় ক্ষতি হল। তাঁদের প্রণাম জানাই, তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ

(১৮৬৮-১৯৩৮)

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের জন্ম অবিভক্ত অসমের শ্রীহট্ট জেলায় হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙে, ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর (২১ ভাদ্র ১২৭৫ বঙ্গাব্দ)। বানিয়াচং রাজবংশের সন্তান পদ্মনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অসম রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ১৮৯০ সালে ইংরেজি, সংস্কৃত ও দর্শনে অনার্স সহ বি.এ. পাশের পর সাফল্যের সঙ্গে সংস্কৃত পাঠক্রম সমাপ্ত করে ঢাকা সারস্বত সমাজ কর্তৃক 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯২ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

অসমের উজ্জ্বল রত্ন পদ্মনাথের কর্মজীবন শুরু হয় শিলঙে, ১৮৯৩ সালের ১০ নভেম্বর, রাজ্য সচিবালয়ের কর্মচারী হিসাবে, সেখানে তিনি সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সুরমা উপত্যকার ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব স্কুল্স-এর কার্যভার গ্রহণের জন্য তিনি ১৮৯৭ সালের ১ জানুআরি শিলং ত্যাগ করেন। সিলেটে বাসকালে তিনি নিজ উদ্যোগে প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে তুলে দেন অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির হাতে, যিনি ওইসব তথ্যের ভিত্তিতে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' প্রকাশ করেন পদ্মনাথের আর্থিক সহায়তায়।

যদিও পদ্মনাথ সিলেটের বিখ্যাত মুরারিচাঁদ কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেছিলেন, ১৯০৫ সালের জুন মাসে ইতিহাস ও সংস্কৃতের শিক্ষক হিসাবে গুয়াহাটির কটন কলেজে যোগদানের পরে তিনি বিশেষভাবে ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২৩ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কটন কলেজে থাকাকালীন তিনি এক ডজনেরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যার মধ্যে 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি', 'কামরূপশাসনাবলী' এবং 'মি. গেইট্'স হিস্টরি অব আসাম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯১২ সালের ৭ এপ্রিল গুয়াহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' (আসাম রিসার্চ সোসাইটি)। অসমের ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে 'কামরূপশাসনাবলী' নিঃসন্দেহে পথিকৃৎ এবং এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছেন এবং 'অসম সাহিত্য সভা'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২২ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার পদ্মনাথকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করে, তবে 'অশাস্ত্রীয়' সারদা আইনের প্রতিবাদে এই খেতাব তিনি ফিরিয়ে দেন।

শেষজীবনে পদ্মনাথ কাশীবাসী হন এবং কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা থেকে 'সমাজ হিতকর গ্রন্থমালা'-র অন্তর্গত তাঁর দুটি বই ('আলোচনা চতুষ্টয়' ও 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ') প্রকাশ পায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৮ সালটি ছিল পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের জন্মের সার্ধশত সমাপ্তিবর্ষ। ❑

হিন্দু বিবাহ সংস্কার *

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য

('হিন্দু ম্যারেজ রিফর্ম লিগ' প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ)

আজ তিন বৎসর হইল, বঙ্গের দুইজন প্রথিতনামা ব্যক্তি হিন্দুসমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ নিবারণকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। তাঁহারা তদর্থে একটি সমিতি গঠন করিবার পূর্বে একখানি (ইংরাজি ভাষায় লিখিত) মুদ্রিত চিঠি বঙ্গদেশস্থ বহু শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের মতামত সংগ্রহ করেন। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকেও একখানি চিঠি দেন; তদুত্তরে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহাই অদ্য 'ব্রাহ্মণ সমাজের' নিকট উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

কিন্তু পূর্বপক্ষ না জানিতে পারিলে উত্তর বুঝিতে অসুবিধা হইতে পারে, তজ্জন্য সেই মুদ্রিত চিঠিখানির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল, পত্রের অন্যান্য দফা উত্তরের অবিষয়ীভূত হওয়ায় সমগ্র চিঠির অনুবাদ দেওয়া হইল না।

(চিঠির আংশিক অনুবাদ)

"সম্প্রতি ইহা বোধহয় এক প্রকার স্থির মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে যে, বাল্য বিবাহ-প্রথা শাস্ত্র-বিধির প্রতিকূল এবং দৈহিক, নৈতিক ও অন্যান্য কারণেও আপত্তিজনক। এই প্রথা হইতে যে সকল দোষ উৎপন্ন হইয়াছে, সংক্ষেপত সেইগুলি এই—

(১) শারীরিক অধোগতি।

(২) দারিদ্র্যবৃদ্ধি।

(৩) বালিকাদের শিক্ষার সুযোগহানি।

(৪) বিবাহের ব্যয় বৃদ্ধি।

(৫) অকাল বৈধব্য ও তদানুষঙ্গিক ফল।

"হিন্দুসমাজ যে, উপরি উল্লেখিত প্রত্যেকটি দোষ সম্বন্ধে জাগরূক হইতেছে, তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। প্রকৃতপক্ষে অবস্থার বাধ্য হইয়া আমাদের বালিকারা আজ কাল সাধারণত ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং কোনও কোনও স্থলে ১৪ বৎসর পর্যন্তও, অবিবাহিতা থাকিতেছে। অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় ছাড়িয়া দিলেও, বিবাহের বয়স বৃদ্ধির দ্বারা যে ব্যয়ভারের গুরুতর সমস্যার একটা নিষ্পত্তি হইবে, এটা সর্বসাধারণের বিশ্বাস; কেননা মাতাপিতা ও অভিভাবকগণ বর্তমান-প্রথানির্দিষ্ট বয়ঃকাল মধ্যে কন্যার বিবাহ প্রদানার্থ অসঙ্গত দাবিদাওয়া বহন করিতে বাধ্য হইতেছেন।"

এস্থলে বলা আবশ্যক যে মৎপ্রদত্ত উত্তরেরও সমগ্র অংশ অবিকল উদ্ধৃত হইবে না; যে সকল কথা সাধারণ ভাবে বলা হয় নাই, তাহা পরিত্যক্ত হইল, এবং মধ্যে মধ্যে বাক্যগত যৎসামান্য পরিবর্তনও করা হইয়াছে।

উত্তর ঃ

ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদিও শাস্ত্রাচারের প্রভাব মন্দীভূত হইয়াছে, তথাপি হিন্দুসমাজের লোকসাধারণ অদ্যাপি শাস্ত্রের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। অতএব সর্বপ্রথমেই দেখিতে হইবে বিবাহের বয়স সম্বন্ধে শাস্ত্রে কী আছে, পুরুষের বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্র-নির্ধারিত কোনও বয়স দেখা যায় না। যাহা হউক, পশ্চাৎ এ বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু বালিকাদের বিবাহ দিবার নিমিত্ত শাস্ত্রে একটা বয়স নির্ধারিত হইয়াছে। সমাজস্থ লোকসাধারণ তাহার সীমা স্বেচ্ছায় অতিক্রম করিতে কদাপি সম্মত হইবে না। "কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ"; সেই পরাশর বলেন—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তাঅত ঊর্ধ্বং রজস্বলা।।
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজ স্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বরম্।। *

ইহাতে দেখা যায় যে রজঃপ্রাপ্তির বয়সের পূর্বে যে রূপেই হউক কন্যা পাত্রস্থা করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের বিধান। এই নিমিত্ত, "বাল্য বিবাহ শাস্ত্র বিধানের প্রতিকূল, ইহা অধুনা একপ্রকার মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে," আপনাদের ঈদৃশী ধারণা কন্যাবিবাহ-বিষয়ে প্রযোজ্য বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারি না। কন্যাবিবাহ বিষয়ক উপরি-উল্লেখিত বিধি হিন্দুসমাজে অতিশয় দৃঢ়ভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তবে কোনও কোনও স্থলে যে ইহার ব্যতিক্রম না হইতেছে, এমন নহে। কিন্তু তাহা অতি বিরল এবং স্বেচ্ছাত নহে।

ঃ এই আপনারাই তো বলিতেছেন, হিন্দুসমাজে অবস্থাবিশেষে বাধ্য হইয়া মধ্যে মধ্যে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সের বালিকা অবিবাহিত থাকে। তখন, এতদপেক্ষা বিবাহের বয়স বাড়াইতে হইলেই কন্যার রজস্বলা হইবার সম্ভাবনা; অতএব ইহাতে শাস্ত্রবিধির অপ্রতিপালনরূপ ধর্মহানির সমূহ আশঙ্কা আছে।

ঃ যে স্থলে ধর্মহানির সম্ভাবনা সে বিষয়ে আপনারা শত সহস্র ব্যক্তির মত সংগ্রহ করিলেও সমাজ তাহা শুনিবে না। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সমাজনায়ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গের অনেকেই ধনলোভে অনেক সময়ে অব্যবস্থা দিয়া নিজ মর্যাদা হারাইয়াছেন। লোকে তাঁহাদের অভিমতও শাস্ত্রানুগত দেশাচারের প্রতিকূল হইলে মানিতে চায় না— অপর সাধারণের অভিপ্রায় তো দূরের কথা। তবে গবর্নমেন্ট যদি সম্মতি আইনের ন্যায় বিবাহের আইন করেন, তবে বাধ্য হইয়া লোকের তাহা মানিতে হইবে। কিন্তু সম্মতি আইনে যে তোলপাড় হইয়াছিল, এই বিবাহ আইন করিতে গেলে চতুর্গুণ আন্দোলন হইবে এবং বর্তমান অশান্তির সময় গবর্নমেন্ট তাহা কখনও করিবেন না। আপনারাও বোধ হয় আইনের দ্বারা সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী নহেন।

আপনারা অবশ্যই দেশের হিতাকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত হইয়া এই ব্যাপারে হস্তার্পণ করিতেছেন। তবে কন্যা-বিবাহের বয়স দুই এক বৎসর বাড়াইলেই যে, সমাজের আকাঙ্ক্ষিত হিতসাধন হইবে তাহা বলিতে পারি না। বরপণহেতুক ব্যয়বাহুল্য কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িলেই যে কমিয়া যাইবে তাহাই বা কিরূপে বলিতে পারি? যাহারা ধর্মের দিকে না চাহিয়া কন্যার পিতার বা অভিভাবকের কাছ হইতে টাকা আদায় করে, তাহারা কন্যার বয়স অনুসারে তো অর্থের হ্রাসবৃদ্ধি করে না। বাল্যবিবাহ নিষেধ-বিধানে অবশ্যই বয়সের একটা সীমা থাকিবে; ধরুন যেন বিধি হইল, ১৪-এর কমে বিবাহ দিতে পারিবে না। আবার বড় জোর ১৬/১৭ বৎসর পর্যন্ত লোকে কন্যাটিকে স্বগৃহে অবিবাহিত অবস্থায় রাখিতে চাহিবে, কেননা ইহার বাড়া হইলে নানা কুলকলঙ্কেরও তো সম্ভাবনা! এতদবস্থায় ৮ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত, এই ছয় বৎসর কাল, কন্যা পাত্রসাৎ করিবার নিমিত্ত অভিভাবকের যে একটা স্বাধীনতা ছিল, তাহার লোপ হইল। অথচ ২/৩ বৎসরের মধ্যে পাত্রসাৎ করিতে না পারিলে কি জানি কি হয় ভাবিয়া অভিভাবক চক্ষে পথ দেখিবেন না। এতদবস্থায় বরপণ কি আরও বাড়িয়া যাইবে না?

এই কুলকলঙ্কের কথা আমি কেন বলিতেছি, অবধান করুন। হিন্দুসমাজে বিবাহের নানারূপ প্রতিবন্ধকতা আছে; যথা, পাত্রটি স্বজাতীয় হওয়া চাই; গোত্রাদি শাস্ত্রানুসারী হইতে হইবে; আবার কৃত্রিম প্রথানুসারে 'মেল' 'ঘর' 'শ্রেণি' ইত্যাদিও দেখিতে হইবে। কন্যাটি যদি প্রাপ্ত-যৌবনা হইয়া অপাত্রে প্রণয়বতী হইয়া উঠে? এই সমাজে যখন গান্ধর্ব বিবাহ প্রচলিত নাই, তখন মাতাপিতাদি নির্বাচিত বরে সমর্পিতা হইতে বাধ্য হইয়া ঈদৃশী কন্যা চিরকাল মানসিক ব্যভিচারগ্রস্তা হইয়া থাকিবে, বিবাহও বরকন্যার সুখের না হইয়া সবিশেষ মনঃকষ্টের কারণই হইবে। বিশেষত ইউরোপীয় সমাজের নানারূপ ঘটনা দেখিয়া আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

অবশ্য বলিতে পারেন, অবরোধাদি প্রথা এইরূপ ঘটিবার প্রতিকূল। কিন্তু গ্রামদেশে কুমারীগণের স্বাধীনতা খুব; অথচ ইদানীং "এত বড় মেয়ে এখনও আইবুড়ো!" এইরূপ একটা লোকনিন্দার ভয়ে অভিভাবকেরা বয়স্থা কন্যাকে যে গৃহনিষ্ক্রান্ত হইতে দেন না, বিবাহের বয়সবৃদ্ধির প্রথা পড়িলে এই সঙ্কোচের ভাব কমিয়া যাইবে।

আরও একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। ৮/১০ বৎসরের কন্যাটিকে যেন তেন পাত্রস্থা করিতে পারিলে দরিদ্র মাতাপিতার একটি সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদন ব্যয়ভারও তো

কমে?

অন্য একটি বিষয়ও ভাবিয়া দেখা উচিত। জাস্টিস মিস্টার টেলাং স্বয়ং সম্মতি আইনের পোষকতা করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজের কন্যা দুইটিকে অল্পবয়সে বিবাহ দিয়াছিলেন। অনেকে তখন তাঁহাকে টিটকারি দিয়াছিল। কিন্তু কিয়দ্দিন পরে যখন তাঁহার মৃত্যু ঘটিল, তখন অনেকেই বুঝিল যে টেলাঙের দুইটি কার্যের মধ্যে দ্বিতীয়টিই বুদ্ধিমত্তার সমধিক পরিচায়ক হইয়াছিল; কেননা জাস্টিস টেলাঙের কন্যার যে পাত্র জুটিয়াছে, স্বর্গীয় টেলাঙের কন্যার তাহা জুটিত কি না সন্দেহ।

বরপণের প্রতিক্ষার কন্যাগণের চিরকৌমার্য প্রথার প্রচলন দ্বারাই কেবল সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং ইহাতে নানা দোষ আছে; বিশেষত উপরে উল্লেখিত দুই একটি আশঙ্কার কারণ আরও গুরুতরভাবে উপস্থিত হইবে।

এক্ষণে, আপনাদের পত্রের দ্বিতীয় দফায় বাল্যবিবাহের যতগুলি দোষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

(১) শারীরিক অধোগতি।

এখন অপেক্ষা আমাদের পিতৃপিতামহের আমলে বালিকাদের আরও অল্পবয়সে বিবাহ হইত। অথচ আমাদের পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আমাদের অপেক্ষা প্রায়শ সবল ও দীর্ঘজীবী ছিলেন। নিম্নশ্রেণির মধ্যে কন্যাপণ প্রচলিত থাকায় কন্যাদের অল্পবয়সে বিবাহ হয়— অথচ উহারা ভদ্রলোকদের অপেক্ষা চিরদিনই সবল ও সুপুষ্ট। অতএব দৈহিক অবনতির অন্য কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইহা স্বীকার্য যে পূর্বে পুরুষদের অল্পবয়সে বিবাহ কম হইত। যাহা হউক পশ্চাৎ এ-বিষয়ে আলোচনা করিব।

(২) দারিদ্রবৃদ্ধি।

বাল্যবিবাহদ্বারা স্ত্রীপুরুষের অধিকতর সন্তান হইবার সুবিধা হয় এবং তজ্জন্য বংশবৃদ্ধি তথা দরিদ্রতারও বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু বংশবৃদ্ধি কি অপ্রার্থনীয়? কেহ কেহ তো আমাদিগকে 'ধ্বংসোন্মুখ' জাতি বলিয়া বৃদ্ধির নানা উপায়েরও নির্দেশ করিতেছেন! যৌবন বিবাহে যে বংশবৃদ্ধি কম হয় তাহাই বা কি প্রকারে বলি? ইউরোপীয় জাতি তো খুবই বাড়িতেছে!

(৩) বালিকাদের শিক্ষার সুযোগহানি।

বালিকারা লেখাপড়া শিখুক ইহা প্রার্থনীয় হইলেও বালকদের তুল্য শিখুক ইহা ইউরোপীয়েরাও অনেকে স্বীকার করেন না। আমাদের স্ত্রীজাতির শাস্ত্রনির্দিষ্ট কার্য, স্বামীর ও তৎপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সেবাশুশ্রূষা করা এবং সন্তান প্রতিপালন। এতদর্থে বিদ্যাশিক্ষার যতটুকু দরকার তাহা ১০/১২ বৎসরের মধ্যেই অনায়াসে হইয়া যাইতে পারে। গৃহস্থালি শিক্ষাকার্যের তো বরং বাল্যবিবাহে সহায়তাই হ; এবং যাহারা ধনীর কুলবধূ হইবে তাহাদের বিদ্যাচর্চারও অবসর বেশি থাকিবে?

(৪) বিবাহে ব্যয়বৃদ্ধি।

এতদ্বিষয়ে পূর্বেই যথেষ্ট বলা হইয়াছে।

(৫) অকাল বৈধব্য ও তদানুষঙ্গিক ফল।

এটা একটা বড় গুরুতর কথা। ১৪ বৎসরের পূর্বে যদি কাহারও বিবাহই না হয়, তবে অবশ্যই ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সের বিধবা সমাজে পরিদৃষ্ট না হইবারই কথা। তবে ১৫/১৬/১৭/১৮ বৎসরের বিধবা তো দেখা যাইতে পারিবে? অর্থাৎ যে বয়সে স্ত্রীলোকেব স্বামীসহবাসসুখ উপভোগ করিবার কথা, সেই বয়সেই বিধবা হইবার আশঙ্কা তো থাকিয়াই গেল? বরং একটি ষোলো বৎসরের বিবাহিতা বালিকা অদৃষ্টদোষে যদি অচিরেই বিধবা হয়, তবে তাহার অবস্থা যাদৃশ দাঁড়াইবে, তত্তুলনায়, দশ বৎসরে বিবাহিতা এবং তখনই বিধবা হওয়া একটি বালিকা ষোল বৎসরে পৌঁছিলে তাহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালই হইবে বলিয়া মনে করি। কেননা প্রথমা ১৬ বৎসর কাল ভোগবিলাসে লালিত হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয়া ৬ বৎসরকাল সংযম অভ্যাস করিয়া ১৬ বৎসরে পৌঁছিয়াছে। উভয়েই তরুণী, কিন্তু প্রথমা তৎকালপর্যন্ত অনভ্যস্তব্রহ্মচর্যা, দ্বিতীয়া তাহাতে সম্যক অভ্যস্তা। দ্বিতীয়া যখন বিধবা হইয়াছিল তখন তাহাতে প্রবৃত্তির অঙ্কুর তেমন জন্মায় নাই, তৎপর ব্রহ্মচর্যবিধান দ্বারা সে প্রবৃত্তিদমনের উপায় সাধন করিয়া আসিতেছে; কিন্তু প্রথমা কিশোর বয়সে বুকভরা আশা নিয়া আসিয়াছিল, হঠাৎ তাহার সমস্ত সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, অথচ যে উপায়ে প্রবৃত্তির দমন করিতে হইবে, তাহাতে সে

সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। দুইটির মধ্যে কাহার ভবিষ্যৎ অপেক্ষাকৃত ভালো হইবার কথা, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

স্ত্রীলোকের অধিক বয়সে বিবাহের আরও দোষ আছে। ইহাতে একান্নবর্তী পরিবারের প্রথাটির সমূহ হানি হয়। "যদস্তি হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব" বাল্যবিবাহেই হইবার সমধিক সম্ভাবনা। এই সমাজে বিবাহভঙ্গ প্রথা নাই; বাল্যবিবাহ প্রথা থাকাতেই ইহার আবশ্যকতাও হয় না; চরিত্র সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইবার পূর্বেই বালিকার বিবাহ হইলে স্বামী অথবা তাহার অভিভাবকেরা ইহাকে গড়িয়া তুলিতে পারেন, স্বভাব পাকিয়া গেলে ইহা অসম্ভব। অথচ 'কোর্টশিপ' প্রথাও নাই যে বর আপন স্বভাবানুযায়ী কন্যা বাছিয়া নিতে পারিবে।

বালকদের বিবাহসম্বন্ধে শাস্ত্রে কোনও বয়স নির্ধারিত নাই, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু পাঠদ্দশায় বিবাহ না করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। এই শাস্ত্রাভিপ্রায়ের বিপরীত আচরণ প্রধানত দুইটি কারণে হয়; ধনীরা অপরিণতবয়স্ক পুত্রের বিবাহ দেয়— শীঘ্র শীঘ্র পৌত্রমুখ দেখিবার জন্য; এবং দরিদ্রেরা পুত্রের বিবাহ দেয়— বহুব্যয়সাধ্য ইংরাজি বিদ্যাশিক্ষার এবং অর্থকর চাকরিপ্রাপ্তির সুবিধা করিবার নিমিত্ত। ইহাতে ছেলের শরীরের যে কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, ইহা সত্য; আবার ইহাতে এক প্রকারে শরীরের রক্ষারও উপায় হয়। কলেজে কাব্যনাটকে প্রণয়কাহিনি পাঠ করিয়া অথবা বাড়িতে ইংরাজি বাংলা নভেল পড়িয়া ছেলের মনে অকালে প্রেমপিপাসার সঞ্চার হয়; তদ্বিষয়ে সে গোপনে চিন্তা করে। এই সময়ে যদি ইহার এতাদৃশ চিন্তাস্রোত একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত না হয়, তবে ফল বড় বিষম হয়, চিত্ত কলুষিত হয়। পরে দিগ্‌বিদিকে গতায়াত করিবার প্রবৃত্তি জন্মে; অথবা প্রায়শ সে কুৎসিত অনুষ্ঠান দ্বারা— অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা সম্পাদন শিখিয়া নিজের ভবিষ্যৎ মাটি করিয়া বসে। বাল্যবিবাহে ইহার অনেকটা প্রতিকার হয়। শুনিয়াছি, হাইকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় নাকি স্বীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে বিবাহ করাইয়া বিলাতে পড়ার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কল্যাণের পথ কী? আমার দৃঢ়বিশ্বাস, অধুনাতন ইংরেজি শিক্ষিতগণ শাস্ত্রাচার না মানিয়া অধঃপতিত হইতেছেন। অজাতরজস্কা বালিকা উপগত হইবে না, ইহা শাস্ত্রাদেশ; কিন্তু অনেকে তাহা মানে না। বিবাহ অর্থ সহবাসানুজ্ঞা নহে। পিতৃপিতামহগণ ইহা বুঝিতেন এবং এতদ্বিষয়ে বিধিনিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করিতেন। তারপর বিবাহকালে এখন বরকন্যার রাশি-নক্ষত্রাদিবিচার বড় একটা হয় না; যে যে স্থলে এই সব দেখা হয়, আমার বিশ্বাস, তত্তৎস্থলে অকালবৈধব্যাদি অমঙ্গল কম হয়। শাস্ত্র না মানিয়াই ইদানীন্তন ছাত্রেরা ব্রহ্মচর্য রক্ষা না করিয়া অপক্ক বয়সে স্ত্রী সহবাস করে এবং তদ্ধেতু স্বয়ং হীনবীর্য হয় ও দুর্বল সন্তান উৎপাদন করে। শাস্ত্রনিষিদ্ধ দিন বা অবস্থা কোনও কিছুই মানিতে কেহ চায় না। আমাদের শাস্ত্রকারগণ কৃপা করিয়া অতি বিচক্ষণভাবে এই সকল বিষয়ে বহু উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; শিক্ষিতাভিমানীদের তাহা মানিয়া চলা দূরে থাকুক, বরং এই সকল কথা 'অশ্লীল' বলিয়া উপেক্ষা করিয়া উহারা আপনাকে সুরুচিসম্পন্ন মনে করিয়া থাকে।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন ঃ-

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্।।

ঋষিবাক্য পদে পদে সত্য। "মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্‌ভ্যামুদরেণ শিশ্না," যে যদ্বারা শাস্ত্রাদেশ উল্লঙ্ঘন করে, সে তদবলম্বনে ইহকালেই ফলভোগ করিয়া তাকে। সুখের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্ষণে 'সংযমশিক্ষা' 'মনুসংহিতা' প্রভৃতি পাঠ্য হইয়াছে। আমার মতে এইরূপ সাহিত্য সংস্কৃত ও ইংরেজিতে পাঠ্য হওয়া উচিত যাহাতে আদিরসের সম্পর্ক অতি কম থাকে। সচরাচর অধীত কাব্যে ও নাটকে (বিশেষত) আদিরসেরই বাহুল্য দেখা যায়। 'কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ' আমাদের এই যে একটি

প্রাচীন অনুশাসন ছিল ইহা বড়ই মঙ্গলজনক ছিল। টোলের প্রাচীনকালের ছাত্রেরা ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিতে পারিত; এখন টোলেও কুমারসম্ভব শকুন্তলা প্রভৃতি প্রভাব প্রকাশ করিয়া ছাত্রদের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিতেছে।

* * *

ফলত আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সংযমের অভাব, শাস্ত্রে ভক্তির গ্রাস, ইত্যাদিই দৃশ্যমান সমস্ত অধোগতির মূল। ইতি

(যে ব্যাপার উপলক্ষে এই চিঠি পত্র চলিয়াছিল, তাহা— সেই হিন্দু বিবাহ সংস্কার সমিতি— সম্প্রতি কী ভাবে বিদ্যমান আছে জানি না। কিন্তু বিষয়টি গুরুতর; এবং বিবাহে বয়সবৃদ্ধি আবশ্যক, এটা হিন্দুসমাজস্থ ইংরেজি-শিক্ষিত অনেকেরই আন্তরিক অভিমত। তাই এতদ্বিষয়ক সামান্য এই আলোচনাটি প্রকাশ করা হইল। যাঁহারা অশেষশাস্ত্রদর্শী ও সমাজতত্ত্বে সম্যক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, এতাদৃশ সমাজহিতৈষীগণের মধ্যে কেহ এই বিষয়ে লেখনী প্রয়োগ করিবেন, উপসংহারে ইহাই আমার প্রার্থনা।)

* বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত দশ সংস্কারের একতম হইলেও এস্থলে 'সংস্কার' অর্থ রিফর্মেশন বুঝিতে হইবে।

* ধর্মশাস্ত্র প্রবর্তক অপরাপর ঋষিরও এতাদৃশীই ব্যবস্থা; বাহুল্যভয়ে ওই সকল উদ্ধৃত করা হয় নাই।❑

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস

(১৮৯৪-১৯৫৫)

বিখ্যাত ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জন্ম ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৩ চৈত্র, রবিবার। পিতা বিরজানাথ ছিলেন কাত্যায়ন গোত্রীয় গোঁড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ। বর্ধিষ্ণু বনেদি বংশ। শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙের রাজবংশের সন্তান। সেখানে রামনাথের ছেলেবেলা কেটেছে বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। প্রথমে টাইফয়েড ও পরে কলেরায় 'রামা'র শিশুজীবন ছিল বড়ই বেহাল। শৈশবে পড়াশোনা হয়নি। প্রায় আট বছর বয়সে কোনোরকমে আরম্ভ হয় লেখাপড়া। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা উভয়েই প্রয়াত। রামনাথ মানুষ হতে থাকেন দাদা-বউদির কাছে। গোঁড়া প্রাচীনপন্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্তমনের মানুষ। তাই কোনো ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠানে রামনাথের প্রবেশ ছিল নিয়ন্ত্রিত। ফলে, বেপরোয়া রামনাথকে বাড়িতে ও পাড়ায় মাঝে-মধ্যেই একঘরে অবস্থায় থাকতে হতো। সে-জন্যই তাঁকে অনেক সময় রাত কাটাতে হয়েছে গাছতলায় শুয়ে।

বানিয়াচং হাইস্কুলে পড়াশোনার পরে তরুণ বয়সেই বিপ্লবী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'-র সঙ্গে যুক্ত হন রামনাথ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'বেঙ্গলি পল্টন'-এর সঙ্গে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি মধ্য-প্রাচ্য ভ্রমণ করেন। মালয়েশিয়াতে কর্মরত অবস্থায় তিনি সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নেন ১৯২৪ সালে। সাত বছর পরে, যখন তিনি প্রকৃতপক্ষে কপর্দকহীন তখন ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই সিঙ্গাপুর থেকে সাইকেলে তাঁর বিশ্ব-পর্যটন শুরু হয়। অদম্য ভ্রমণস্পৃহায় রামনাথ চারটি মহাদেশ সফর করেন সাইকেলে চেপে এবং বেশ কয়েকবারের পর্যটনে ওইসব দেশের কারুজীবী, শ্রমিক, কৃষক সহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

যদিও রামনাথ বিদ্যালয়জীবনের পরে আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি, বাংলা ভাষার উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁকে তিরিশটিরও বেশি ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনায় অনুপ্রাণিত করে। তাঁর রচনার মাধ্যমেই আমরা কামাল পাশার পুনর্গঠিত তুরস্কের বিষয়ে জানতে পারি এবং আধুনিক চিনের বিশাল তৎপরতার বিষয়েও তিনিই বাঙালি পাঠকদের প্রথম অবহিত করেন। অর্থবল না-থাকায় বিদেশ ভ্রমণকালে তিনি কতবার কতরকম সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তারও চিত্তাকর্ষক বিবরণে তাঁর ভ্রমণকাহিনিগুলি সমৃদ্ধ।

ভ্রমণকাহিনি-রচয়িতা হিসাবে রামনাথের অনন্যতা যেমন প্রতিষ্ঠিত তেমনই ভূপর্যটক হিসাবেও তিনি সার্থকনামা। তাঁর লেখা বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে 'তরুণ তুর্কী', 'মরণবিজয়ী চীন', 'লাল চীন', 'জুজুৎসু জাপান', 'ইরানের আর্য' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ❑

ফ্রান্সে ভারতীয় ভূপর্যটক

রামনাথ বিশ্বাস

প্যারির পথে

'ফ্রান্স' শব্দ সম্মোহনকারী। এমন অনেক ভারতবাসী আছেন, যাঁরা 'ফ্রান্স' 'প্যারি' এসব শব্দ শোনা মাত্র ধারণা করেন, ফ্রান্সই পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এই ধারণা অনেকের মনে জাগ্রত ছিল। আমিও মনে করতাম, 'ফরাসি দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে বিজলি বাতি ব্যবহার হচ্ছে। ফ্রান্সে কিবা দিন কিবা রাত সকল সময়ই হয় সূর্যের আলো নয় ইলেকট্রিক আলো আছে।' সুখের বিষয় ইউরোপের বুলগেরিয়া, যুগশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, জার্মানি, হল্যান্ড এবং বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ ফ্রান্সে পৌঁছাবার পূর্বেই, ভ্রমণ করেছিলাম, সেজন্যে ফ্রান্স সম্বন্ধে যত আজগুবি ধারণা সবই চলে গিয়েছিল। এই আজগুবি কথার পেছনে ছিল আমাদের দেশ থেকে যারা সমুদ্রপথে প্রথম ইউরোপ ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন এবং ভোগ বিলাস চরিতার্থ করেছিলেন, তাদের ভ্রমণকাহিনি পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে ফ্রান্স এবং বর্তমান ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রগুলির পার্লামেন্টারি সিস্টেমে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ সুবিধা উনিশ শত সালের শেষের দিকে ভিত্তি স্থাপন করেছিল। সেই সংবাদ আমাদের দেশের লোক রাখত না। যাঁরা রাখতেন তাঁদের সংখ্যা পাঁচ আঙুলের একটি অথবা দুটিতেই গুনতে পারা যায়।

রুশিয়া এবং চিনে যে বিপ্লব হয়েছে তার অগ্রদূত ফ্রান্স। অবশ্য ধারা ভিন্ন রকমের হতে পারে কিন্তু পথপ্রদর্শক যে ফ্রান্স তাতে কোনো ভুল নাই। সেই মহাবিপ্লবের জন্য ফ্রান্স পৃথিবীর সাধারণ লোকের কাছে চিরবরেণ্য। আমরা সে কথা কখনো ভুলতে পারি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, পথপ্রদর্শক ফ্রান্স আজও ধনতন্ত্রবাদীদের পদানত।

বেলজিয়মের সীমান্তের সবচেয়ে বড় শহর ম্যন্ পেরিয়ে আসার পরেই পুলিশের কড়কড়ি বেশ মালুম হয়েছিল। মেজিনো লাইনের আশেপাশেও তেমন কড়াকড়ি টের পাইনি। এদিকে পুলিশের এত উৎপাতের কারণ মোটেই বুঝতে পারিনি। পুলিশ আমাকে দাঁড়াতে বলত, তারপর পাসপোর্ট দেখত। পাসপোর্ট দেখা হলে কত টাকা সঙ্গে আছে জিজ্ঞাসা করত। বুদ্ধি করে পাঁচ পাউণ্ডের একখানা নোট পাসপোর্টের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। সেই নোট দেখানোমাত্র পুলিশ পথ ছেড়ে দিত। এরা কিন্তু বেলজিয়ান পুলিশ এবং তখনও আমি বেলজিয়ামের মধ্যেই ছিলাম। এদের জিজ্ঞাসা করতাম, "তোমাদের কী হল হে? এত বাড়াবাড়ি কেন?" ইংলিশেই কথা বলতাম, তারা বুঝত কিন্তু উত্তর দিত না, শুধু হাসত। আমি বলতাম, "তোমরা হাসছ, কিন্তু জান না সাইকেল থেকে উঠা-নামা করতে শরীরের কত রক্ত জল করতে হয়?" তবুও তারা হাসত। বাস্তবিক একা পথ চলতে যেমন আনন্দ তেমনি মতিভ্রমও হয়।

ভুলে গিয়েছিলাম, স্পেনে জোর গণ্ডগোল আরম্ভ হয়েছিল। অনেক বিদেশী সেদিকে জাল পাসপোর্ট নিয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল। ইউরোপের সর্বত্র জাল পাসপোর্টের প্রচলন ছিল। আমাদের দেশে সেরকম জাল পাসপোর্টের এখনও দরকার হয়নি, না হাওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যখন দরকার হবে তখন কারো উপদেশের অপেক্ষায় জাল পাসপোর্ট তৈরি বন্ধ হবে না।

ইউরোপে জাল পাসপোর্টের কীরকম প্রচলন, প্যারি নগরীতে থাকার সময়ে একজন নরউইজিয়ান আমাকে দেখিয়াছিলেন। নরউইজিয়ান একজন দুর্দান্ত লোক। তাঁকে কেউ ভদ্রলোক বলত না। আমি তাঁকে 'ভদ্রলোক' বলতাম এবং কাজের প্রশংসা করতাম। আমাদের দেশের মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য করেছিলেন। তাঁর লোকবল, খ্যাতি এবং অন্যান্য অনেক গুণ থাকার জন্যে ব্রিটিশ সরকার যদিও তাঁকে জেলে পাঠাত, কিন্তু তাঁর ওপর কোনো অত্যাচার করতে সাহস করত না। এই ভদ্রলোকও আইন অমান্য করতেন এবং মনের বাসনা পূর্ণ করার জন্য দেশ দেশান্তরে বেড়াতেন। পাসপোর্ট-আইন অমান্য করার জন্য ইনি অনেকবার জেলে গিয়েছিলেন। জেলে নির্যাতিত হয়েছিলেন এবং নির্যাতন ভোগ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে অনেক রকমের উপায়ও উদ্ভাবন করেছিলেন।

ম্যন শহর থেকে তেরো কিলোমিটার গেলেই ফরাসির দেশ। কিন্তু এই তেরো কিলোমিটার যেন শেষ হতে চাচ্ছিল না! উঁচু নীচু পাহাড়ে পথ, উপরন্তু বার বার পুলিশের খোঁজ এবং তল্লাশির জন্যে ওই তেরো কিলোমিটার পথ চলতেই আমার তিন ঘণ্টা কেটে গিয়েছিল। সীমান্তে পৌঁছানোর পর ফরাসি পুলিশ দস্তুর মতো খোঁজ এবং তল্লাশি করল। পুলিশে পাসপোর্ট সিল করল না দেখে জিজ্ঞাসা করলাম "এটা তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নয়, পাসপোর্টে সিলমোহর করা হল না কেন?" কাস্টম অফিসার শুধু 'পাকৃতি' বলেই বিদায় দিয়েছিল।

যাদের কাছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকত তারা ফ্রান্স, লুকসেমবুর্গ, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, জার্মানি, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লাভাকিয়া, এবং অস্ট্রিয়া পর্যন্ত বিনা 'ভিসা'তেই ভ্রমণ করতে পারত, পাসপোর্টের ভিসা নেওয়া ব্যয়সাধ্য। এই ব্যয় ভার হতে সাধারণ লোককে অব্যাহতি দেবার জন্য ভিসা প্রথা পশ্চিম ইউরোপে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

বর্তমান আইনের পরিবর্তন হয়েছে। তবুও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে যে সমস্ত দেশ আছে, সেই দেশগুলির পক্ষে ব্রিটিশ পাসপোর্টের দ্বারা মিত্র রাজ্যগুলিতে যে সুবিধা পাওয়া যেত সেই সুবিধা বর্তমানেও পাওয়া যাচ্ছে বলেই শুনতে পাচ্ছি।

ফ্রান্সে 'পাকৃতি' শব্দের অর্থ নানা রকমের। শব্দটি যখন কর্কশ স্বরে উচ্চারণ করা হয় তখন 'যা যা' বুঝায়। যখন কোমল স্বরে উচ্চারণ করা হয় তখন 'যান' বুঝায়। ফ্রান্সে অবজ্ঞা করেই আমাকে পাকৃতি বলা হত তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না।

জার্মানি এবং ফ্রান্সের মধ্যে মিত্রতা ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য উভয় রাষ্ট্র প্রস্তুত হচ্ছিল। তবুও জার্মানি ফ্রান্সের কী করে মিত্র বা 'এলাই' এটা নিশ্চয়ই জানবার বিষয়; সেই মিত্রতার মানে আমি জানতাম। আজ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা পূর্ব ইউরোপের সবাইকে ইউরোপিয়ান বলে স্বীকার করে না যেমন বুলগেরিয়ান, ইয়ালিয়ান, গ্রিসিয়ান, হাংগেরিয়ান, ক্রুটিয়ান, শ্লাভাকিয়ান, জর্জিয়ান, ইউক্রেনিয়ান ইত্যাদি। রাশিয়াতে শ্বেত রুশিয়া নামে একটি প্রদেশ আছে, সেই প্রদেশের লোককে পশ্চিম ইউরোপের লোক ইউরোপিয়ান বলে স্বীকার করত।

শ্বেত রুশিয়া, পোল্যান্ড, জার্মানি, চেকোশ্লাভাকিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং গ্রেট ব্রিটেন— এই কয়টি দেশই পূর্বকালে এবং বর্তমানেও ইউরোপ নামে পরিচিত। যদিও পোপ একদা এই দেশগুলিতে রাজত্ব চালাতেন, যদিও পর্তুগালের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজবংশের নিকট বৈবাহিক সম্বন্ধ তবুও ইটালি এবং স্পেনকে ইউরোপিয়ান বলে সকলে স্বীকার করত না। এই দুটি দেশও পূর্বদেশের অন্তর্ভুক্ত। এসব কথা কোনো বই-এ আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি, ভবিষ্যতেও লেখা হবে না। এসব গোপন কথা জানতে হলে সারা ইউরোপে পর্যটন এবং লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা না করলে জানা যায় না। কথা হল, কার এত মাথা ব্যথা হবে এসব বিষয় জানার জন্য? ভিক্ষা করে ইউরোপে ভ্রমণ করেছিলাম সেজন্যই এত গুহ্য কথাও জানতে পেরেছিলাম। বিত্তশালী পর্যটক এসব কথা কোনো মতেই জানতে পারবে না।

পশ্চিম ইউরোপের এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হলে ভিসার দরকার হত না, পাসপোর্ট থাকলেই চলত। এমন-কি যদি কোনো এশিয়াবাসীর কাছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকত তবে উল্লিখিত দেশগুলিতে বিনা ভিসাতেই এক দেশ থেকে অন্যদেশে যেতে পারত। আমার কাছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট ছিল সেজন্যই ভিসার দরকার হত না।

ফরাসি সীমান্ত অতিক্রম করার পর বাভাল (Baval) নামে একটি ছোট্ট গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রামটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং অনেকগুলি হোটেল দ্বারা সজ্জিত। সুখের বিষয় গ্রামের এমন একটি হোটেলে থেকেছিলাম যে হোটেলের অনেকেই ইংলিশ বলতে পারত। হোটেল ছিল পারিবারিক। এখানে খাওয়া এবং থাকার স্থান পাওয়া যেত।

ফ্রান্সে এসেছি, ফরাসিদের সঙ্গে থাকব, কথা বলব এবং তাদের আচার-ব্যবহার জানবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব এটাই ছিল ইচ্ছা। ভাবছিলাম এটাই ফরাসি হোটেল, কারণ গ্রামের মধ্যে যত হোটেল ছিল তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাহাড়ের দিকে মুখ-করা। বারান্দাতে নানা রকমের ফুলগাছ এবং সেখানে কোন দুর্গন্ধ মোটেই ছিল না। শুধু থাকবার চার্জই বার ফ্রাংক এবং প্রত্যেক মিলের জন্য দশ থেকে বার ফ্রাংক এবং সেই সঙ্গে কাফি এবং রুটি-মাখনের জন্যে পঞ্চাশ সেনতিম করে দিতে হত। অতএব এটা একটা উচ্চশ্রেণির হোটেল বলতেই হবে। দ্বিতীয়ত যে মেয়েটি আমার সঙ্গে কথা বলত তাকে আমার চোখে ভালই দেখাত, তবুও কোথায় যেন কী গলদ ছিল, মন খুলে কেউ কথা বলত না।

বিকেল বেলা মেয়েটি যখন তার ছোট ভাইবোনদের নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : অন্যান্য যাঁরা এখানে বাস করেন, তাঁরা সবাই কি ফরাসি? এদের মধ্যে জার্মান কিংবা ইটালিয়ান কি কেউ নেই?

এখানে আমরা ছাড়া সকলেই ফরাসি।

তোমরা তবে কোন্ জাত?

আমাদের পূর্বপুরুষ নাকি ইহুদি ছিলেন, সেজন্যে আমাদের 'ইহুদি' বলা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই আমরা এদেশ ছেড়ে যাব।

কোথায় যাবে?

ঠিক হয়েছে সাংহাই হয়ে কানাডা যাব এবং সেখানে বসবাস করব।

উত্তম কথা খুকি, তোমরা সাংহাই হয়ে কানাডায় যাও সেটা আমিও পছন্দ করি। সেখানে ইহুদি-বিদ্বেষ তত নেই।

কুকি বললে, "যাতে আমাদের 'ফরাসি-ইহুদি' না লেখা হয় বাবা তারই জন্যে চেষ্টা করছেন। যদি আমাদের জাতের নাম 'ফরাসি' হয়, তবেই আমরা বেঁচে যাব। আমার মা এবং বাবা উভয়েই রোমান ক্যাথলিক, আমাদের ভাষা ফরাসি, তবুও আমরা কী করে ইহুদি হলাম সেটা ভেবেই পাচ্ছি না। আমরা মনট্রিয়েলের দিকে যাব, সেখানে সকলেই নাকি ফরাসি।"

কানাডায় তোমরা যাবে সেজন্যই কি ইংলিশ শিখছ?

না তেমন উদ্দেশ্য নাই, যদি সেখানে না যাওয়া হয় তবে অন্যত্র যেতে হবে, হিটলার তো সর্বপ্রথমেই আমাদের হত্যা করবেন সে কথা কি আমরা বুঝি না। বোধ হয় এই মাসের শেষের দিকেই আমাদের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে। আমরা শুধু বাড়ি বিক্রির অপেক্ষায় আছি।

খুকির কথায় প্রাণে বেশ আঘাত লেগেছিল। উপদেশ দেবার মতো ভাষা ছিল না, সাহায্য করারও কোনো উপায় ছিল না। শুধু ভাবছিলাম, এটাই কি সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার দেশ? আমাদের দেশে যে-কোনো মুহূর্তে একজন হিন্দু, মুসলমান হতে পারে, আবার পরের দিন ইচ্ছা করলেই মুসলিম ধর্ম পরিত্যাগ করে হিন্দু হবার অধিকার রাখে, যে-কোনো প্রদেশে বাস করার পর সেই দেশের জাতিতে পরিণত হতে পারে, যদিও তেমন ইচ্ছা কেউ করে না কিন্তু ফরাসি দেশে সে অধিকার কারো নাই। — অন্তত ইহুদিদের যে নাই স্বচক্ষে তা দেখে দুঃখিত হয়েছিলাম।

পরদিন সকালেই পথে বেরিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি করে প্যারিতে পৌঁছানো চাই। সে দিনই চেমব্রাই যাব ঠিক করেছিলাম কিন্তু পথ তেমন ভালো ছিল না। পিচ দেওয়া পথের মধ্যেও ছোট ছোট 'খাল বিল' হয়ে রয়েছিল। দুদিকে পথের বাড়ি ঘর দেখতে তেমন মনোরম ছিল না। সর্বত্রই জনহীনতা মনে হচ্ছিল। পথে যাদের সঙ্গেই দেখা হচ্ছিল তারাই যেন আধমরা, নেহাত চলতে হচ্ছে সেজন্যই যেন চলছিল। পথচারীদের দেখলেই মনে হত যেন বেকার, অথবা আমাদের দেশে চৈত্রমাসে প্রখর রৌদ্রে পথিক বিরক্তির সঙ্গে যেমন করে পথ চলে, ঠিক তেমনি বিরক্তি ভাবে সকলেই পথ চলছিল অথবা রেঁস্তোরায় বসে রয়েছিল।

বিকেলের দিকে একটি মাঠে কতকগুলি গরুকে ঘাস খেতে দেখে একটু দাঁড়ালাম। পাশেই একজন লোক গরুর দুধ দুইছিল. আমাকে সেখানে দাঁড়াতে দেখে কোথা থেকে কতগুলো লোক এল এবং প্রথমত ফরাসি ভাষায় কী বলল।

তাদের বলছিলাম, "ফরাসি ভাষা আমার জানা নেই, ইংলিশ বলতে পারি।"

"হাঁ বুঝতে পেরেছি, মশায় হচ্ছেন ব্রিটিশ প্রজা। আমি কানাডায় যাব ঠিক করে ইংলিশ শিখেছিলাম কিন্তু সাত রাজার ধন জাহাজ-ভাড়া কোনমতেই জোগাড় হয়নি। মহাশয়ের দেশ কোথায়?"

— ইন্ডিয়া।

— কী করে এখানে এলেন?

— এই সাইকেল করে।

— মিথ্যা কথা, ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এসব হল পাশাপাশি দ্বীপ। জাহাজ ছাড়া কী করে আসা যায়!

লোকটা নিরেট মূর্খ, তার সঙ্গে তর্ক করা চলে না, সেজন্য বলেছিলাম, "আপনার কথাই ঠিক, জাহাজে করে হল্যান্ডে এসে সেখান থেকে সাইকেল করে এখানে এসেছি। আচ্ছা বলুন এখানে থাকবার জায়গা কোথাও হবে?"

— আচ্ছা দাঁড়ান ওই যে দেখছেন ভদ্রলোক দুধ দোয়াচ্ছেন তিনি হলেন এখানকার ম্যানেজার অর্থাৎ আমাদের সর্দার। পরিবার নিয়ে থাকেন এবং দুই একজন লোককে থাকবার মতো স্থানও দিতে পারেন। এখান থেকে কোথায় যাবেন বন্ধু?

— এখান থেকে প্যারি যাব।

— অনেকদূর, গাড়ি দু-জায়গায় বদলাতে হয়। আপনার কষ্ট হবে না, আর কয়েক কিলোমিটার— গেলেই রেল লাইনের পাশ দিয়ে পথ পাবেন। আচ্ছা চলুন দেখা যাক উনি জায়গা দেবেন কিনা?

গৃহকর্তা এক কথায়ই আমাকে খাদ্য এবং বিছানা দিতে রাজি হলেন। কিন্তু গৃহের আসল মালিক গৃহিণী। গৃহিণীর আদেশ ছাড়া গৃহে প্রবেশ করা যায় না। এঁরা ভেবেছিলেন আমি বিনা পয়সায় থাকতে চাই সেইজন্য গৃহকর্তা কয়েকবারই ঘরে গিয়েও ঘর হতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশেষে আন্দাজে বুঝতে পারলাম, বিনা পয়সায় গৃহিণী ঘরে স্থান দেবেন না। তাড়াতাড়ি করে পাঁচ ফ্রাংকের একখানা নোট বের করে গৃহকর্তার হাতে দিলাম। নোটখানা তাঁর স্ত্রীর হাতে দেওয়া মাত্র সহাস্য বদনে মা লক্ষ্মী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং করমর্দন করে একটি রুম দেখিয়ে বললেন "এখানে থাকবেন"। তারপর বাথরুম দেখালেন। এটাই হল পেইংগেস্টকে সংবর্ধনা করার নিয়ম। যিনি দোভাষীর কাজ করেছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম আর কত দিলে এঁরা সন্তুষ্ট হবেন? দোভাষী বললেন "আরও দু ফ্রাংক দিয়ে দিন তবেই হবে, এমন-কি বেশি দেওয়া হয়ে গেল বলতে হবে।"

একটু বসার পরই যখন গৃহিণী এক পেয়ালা কাফি, ঘন দুধ এবং রুটি হাজির করলেন তখন মনে হল আমার পয়সা সার্থক হয়েছে। যে-কোনো রেস্তোরাঁতে এই ঘন দুধটুকুর দামই পঞ্চাশ সেন্তিম। রুটিও আজকেরই এবং সঙ্গে প্রচুর মাখন ছিল। বিছানা ছিল পরিষ্কার। লোকের কোলাহল মোটেই ছিল না। চিন্তা করে দেখলাম এমন সুন্দর গোলাবাড়িতে দুদিন থাকলে শরীর বেশ শক্তিশালী হবে। গৃহিণীর হাতে আরও দশ ফ্রাংক দিয়ে বললাম, "কাল পরশু দুদিন এখানে বিশ্রাম করে প্যারি রওনা হতে চাই, এতে কোনো আপত্তি আছে কি?"

এই পরিবারের লোক পনেরো ফ্রাংক বোধ হয় কখনো একত্রে দেখেনি। তাই এদের কত আনন্দ। সেই সঙ্গে দোভাষী লোকটিও আমার একই রুমে থাকবে তারও ব্যবস্থা হল।

গোলাবাড়ির চারদিকে কাঠের খুঁটি পুঁতে বেড়া দেওয়া হয়েছিল। খুঁটির সঙ্গে কাঁটা তার জড়ানো ছিল। কোনোমতেই গরু পালাতে পারত না। পেছনের দিকে পাহাড়ে জায়গায় অনেকগুলি ফার গাছ ছিল। পাশেই আপেল, তুত এবং অন্যান্য রকমের ফলের বাগান। বাগানের ফল শেষ হয়েছিল, তবু দু-একটা যে ছিল না বলা চলে না। শীতের বাতাস বইতে আরম্ভ করেছিল। ফল গাছের পাতাগুলি ঝরে পড়েছিল। ফল-বাগানের পেছনের দিকে আর একটা ছোট ঘর, সেই ঘরটাতেই দোভাষী থাকতেন। আমার সুবিধার জন্যে ম্যানেজারের ঘরে এসেছিলেন। তিনিও একজন মজুর। মালিকের আদেশে ছোট ঘরটাতে থাকবার অধিকার পেয়েছিলেন। ইনি সপ্তাহের শেষে মাইনে পেতেন। এঁদের কাজ ছিল গাই দুইয়ে বিকালের দিকে দুধভর্তি ড্রামটাকে তুলে দেওয়া। দুধ সোজা প্যারিতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। তাজ্জব হতে হয়েছিল কী করে এত দূরে নিয়ে গিয়ে দুধ বিক্রি করা হয়, অথচ বর্ধমান থেকে কলিকাতায় কাঁচা মালও পাঠানো সম্ভব হয় না। আমাদের দেশের এইটেই বিশেষত্ব।

এঁদের মাইনে খুব কম কিন্তু পেট ভরে দুধ, মাখন খেতেন এই যা ছিল সান্ত্বনা। দোভাষী তাঁর ঘর দেখিয়ে বলছিলেন, "দেখুন তো কেমন সুন্দর ঘর?" বাস্তবিক ফ্রান্সের মজুরই এমন সুন্দর ঘর ও বিছানা আশা করতে পারে, আমাদের দেশের মজুর এমন বিছানা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না, কখন যে এরূপ বিছানায় শুতে পারবে বলা বড়ই শক্ত।

ঘরটার অবস্থিতি মোটেই পছন্দ হয়নি। পাশ দিয়ে একটি পার্বত্য ছোট জলধারা কল কল করে বয়ে যাচ্ছিল। ক্রমাগত ঠান্ডা বাতাস সেদিক থেকে আসছিল। যদিও উত্তম লেপ এবং জাজিমের বন্দোবস্ত ছিল তবুও ঘরে বাস করা শীতের দেশে আরামের নয়। ঘর দেখেই ফিরে এসেছিলাম।

পায়ের-পাতা-পচা রোগ ইউরোপ আমেরিকায় এবং শীত প্রধান দেশের সর্বত্র দেখা যায়। আমাকেও সেই পা-পচা রোগ ধরেছিল। এর কোন বিহিত না করতে পেরে খালি পায়ে শিশির-বিন্দু লাগা ঘাসের ওপর পায়চারি করেছি অনেকদিন। কিন্তু এসব হাঁটাহাঁটি এবং অন্যান্য ওষুধ ব্যবহার করেও এই রোগ থেকে রক্ষা পাইনি। ইউরোপ থেকে ভ্রমণ করে দেশে ফিরে অনেক ডাক্তারের শরণাপন্ন হই, কিছুতেই কিছু হয়নি। অবশেষে নিজেই বুদ্ধি খাটিয়ে এই রোগের ঔষধ আবিষ্কার করেছিলাম। যে কোনো প্রকারের জলের সঙ্গে পটাশ পারমাংগানেট মিশিয়ে পায়ের পাতা দুটোকে সেই জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে তারপর ভালো করে মুছে শয্যা গ্রহণ করা। শোবার আগে তিন-চারদিন একরকম করার পর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেছিলাম। এই রোগের ঔষধ সানফ্রান্সিসকো থাকার সময় আবিষ্কার করি। তখন আমার ভ্রমণ শেষ হয়েছিল। পায়ের-পাতা-পচা দুর্গন্ধ রোগ নয় বৎসর আমাকে কষ্ট দিয়েছিল।

খালি পায়ে হাঁটছি দেখে গৃহকর্তা অবাক হলেন এবং দোভাষীর সাহায্যে জিজ্ঞাসা করেন, এরকম হাঁটার কারণ কী? যখন শুনলেন যে পায়ের পাতা-পচা রোগ এতে সারবার সম্ভাবনা রয়েছে তখন তিনিও আমার সঙ্গে মাঠে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। এতে তাঁর উপকার হয়েছিল কি না জানি না। আমার কিন্তু কোন উপকার হয়নি। মানুষ রোগ থেকে মুক্ত থাকতে চায়, রোগমুক্ত থাকার জন্যে নানা প্রকারের উপায় অবলম্বন করে। কোনোটা সফল হয়, আবার কোনোটা একেবারে অকেজো, তা বলে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা কোনো মতেই যুক্তিযুক্ত নয়।

পার্বত্য পথে

গোলাবাড়ির জীবন ছিল অতি সুখের, তবে সর্বত্র সুখ পাওয়া যায় না, দুঃখও পেতে হয়। আমাদের দেশে যাকে 'গ্রাম' বলা হয়, ইউরোপের গোলাবাড়িও তার চেয়ে ভালো অবস্থায় রাখা হয়। তর্কের ছলে অনেকে হয়তো বলবেন, আবহাওয়ার জন্যেই এরকম হয়। আমাদের দেশের মতো আবহাওয়া এবং অবিকল সুযোগ সুবিধা পৃথিবীর অনেক দেশে আছে, কিন্তু কোথাও আমাদের দেশের মতো গোলাবাড়িযুক্ত গ্রাম দেখতে পাওয়া যায় না। এর একমাত্র কারণ হল আর্থিক দুরবস্থা আর সাংস্কৃতিক রুচির অভাব। আর্থিক বিষয়টির চর্চা না করে সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে এখানে চর্চা করাই ভালো। এই ধরুন উনুন। আমাদের দেশের শহরে কয়লা ব্যবহার হয়, গ্রামাঞ্চলে ক্বচিৎ কয়লা দেখতে পাওয়া যায়। ইউরোপের গ্রামাঞ্চলেও সর্বত্র কয়লা পাওয়া যায় না, সেসব জায়গায় রান্নার জন্যে সাধারণত কাঠ পোড়াতে হয়। আমাদের উনুন মাটির সঙ্গে কথা বলে। ইউরোপে কোনো উনুন আড়াই ফুট উঁচুর কম দেখা যায় না। সে-দেশে রান্নাঘরে মস্ত বড় একটা টেবিল থাকে, তার চারপাশে থাকে চেয়ার। অনেকে রান্নাঘরে বই পড়তে ভালোবাসে। আমাদের দেশে রান্নাঘরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। যাদের উনুন মাটির লেভেলে থাকে তাদের ঘরে যদি ধুলে ওড়ে, তবে সেই ধুলো হাঁড়ি কড়াই-এ পড়ে। ইউরোপিয়ানদের উনুন উঁচু লেভেলে থাকায় হাঁড়ি কড়াইয়ে ধুলোবালি পড়তে পারে না— আমরা বাঙালি, সব সময়ে ভাতের চিন্তা করি। পশ্চিম ইউরোপের লোকে সবসময়ে আলুর কথাই ভাবে। কিন্তু আলু যদি না পায় তবে তারা মরে না। তাদের উনুনে জল চড়ানো থাকে, তাইতে যে-কোনো রকমের শাক সবজি সিদ্ধ করে খায়। ইউরোপে উনুন থেকেই কেমিস্ট্রির জন্ম হয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মানরা প্যারির উত্তর দিকটা পর্যন্ত জয় করেছিল। বিজয়ী জার্মানরা সাধারণ লোকের অভাবের কথা শুনত না। একটি ক্যাথলিক মঠে উনিশটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে তিন জন ক্যাথলিক পাদ্রি থাকতেন। একদিন সকালবেলা দেখা গেল ঘরের ভিতরে অথবা বাইরে

এমন কিছু নেই যা সিদ্ধ করে খেতে পারা যায়। তিনজন পাদ্রি রান্নাঘরের একটা হাঁড়িতে জল চড়িয়ে ভাবছিলেন কী সিদ্ধ করে উনিশটি ছেলে মেয়ের মুখে কিছু দেওয়া যেতে পারে। অনেকক্ষণ চিন্তার পর একজন পাদ্রি চিৎকার করে বলে উঠলেন, "আমাদের খাদ্যের অভাব অন্তত এক মাসের মধ্যেও হবে না।" উৎসুক হয়ে অন্য দুজন জিজ্ঞাসা করলেন, "এমন কী পেলেন, যা খেয়ে আমরা অন্তত একমাস বাঁচাতে পারব?" আবিষ্কারক পাদ্রি বললেন, "আমাদের মাঠে প্রচুর পরিমাণে ফুলকপি বাঁধাকপি ওলকপি হয়েছিল। জার্মানরা শিকড়ের উপর থেকে কেটে নিয়েছে, শিকড় তো পড়েই আছে। উপরন্তু কয়েকটা শিকড়ে পাতাও গড়িয়েছে। চল আমরা শিকড় এবং কিছু পাতা উঠিয়ে আনি।" বাইশজন মানুষ অমনি মাঠে গেলেন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপযুক্ত কপির শিকড় এবং পাতা উঠিয়ে আনলেন। জল টগবগ করে ফুটছিল। পাতাগুলি ভালো করে ধুয়ে গরম জলে ফেলে দেওয়া হল। পাতাগুলি সিদ্ধ হবার পর সিদ্ধপাতাগুলিকে ঘুটে তাই দিয়ে করা হয়েছিল 'স্যুপ'। শিকড়গুলি সিদ্ধ করে তার ভিতর থেকে কোমল অংশ বের করে তাই দিয়ে করা হয়েছিল পেস্ট। উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খাদ্য খেয়ে বাইশজন লোক স্ব স্ব চিন্তা অনুযায়ী দ্বিপ্রহরের খাদ্য জোগাড় করতে পেরেছিল। কত বৎসর ধরে যুদ্ধ চলেছিল, সেই মঠের কেউ না খেয়ে মরেনি। এইখানেই ইউরোপিয়ানদের বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়, অথচ আমাদের দেশে বুদ্ধি এবং সংস্কৃতির অভাবে বৎসরে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরে। ইউরোপে যাদেরই বাড়িতে নিজস্ব বাগান থাকে, তারা কখনও খাদ্যের অভাবে মরে না। ভারতীয় সংস্কৃতির যারা প্রশংসা করেন তাদের সঙ্গে আমি একমত নই।

বি.এসসি. পাশ করা লোককেও গ্রহণের সময় গঙ্গায় স্নান করতে দেখা যায়। গঙ্গায় কর্দমাক্ত জলে নাকি পোকা হয় না, এসব লোক বলে বেড়ান। বৈজ্ঞানিক হয়ে কুসংস্কার পরিত্যাগ না করাই হল এর একমাত্র কারণ। কুসংস্কার কোথা হতে এল এখানে বিচার্য নয়, তবে বলতে বাধ্য আমাদের সংস্কৃতির কোনো গুরুত্ব নেই।

দু-দিন পরে গোলাবাড়ি ছেড়ে আবার পথে বের হয়েছিলাম। দিনটা ছিল বড়ই খারাপ। সকালবেলা আকাশ মেঘে অপরিষ্কার ছিল। তারপর দক্ষিণ দিক থেকে দমকা হাওয়া সাইকেলের গতি কমিয়ে দিচ্ছিল। ফাঁড়িপথ ধরে চলছিলাম। দু-দিকে নানা রকমের বড় বড় গাছের সারি দমকা হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করছিল। চলতে কষ্ট হচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে অনেকগুলি গ্রাম ও গোলাবাড়ি পেরিয়ে গেলাম। সন্ধ্যার আগে বোহিন (BOHIN) গ্রামে পৌঁছে ইচ্ছা হল, 'এই গ্রামটাতে আজ থাকলে মন্দ কী?' আটত্রিশ কিলোমিটারের মতো পথ চলে এসেছি। প্রাকৃতিক দৃশ্য তো চিরকাল থাকবে, কিন্তু যে ফরাসি জাতিকে আজ ফরাসি দেশে দেখছি, ভবিষ্যতে এই জাত হয়তো মুছেও যেতে পারে।

ইউরোপের গ্রামের তুলনা দিতে হলে ইউরোপিয়ান অধ্যুষিত যে-কোনো গ্রামের সঙ্গে তুলনা দেওয়া চলে। বিশেষ করে ফ্রান্স একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ। পশ্চিম ইউরোপের সকল দেশই সাম্রাজ্যবাদী। বিদেশের রক্ত শোষণ করে নিজের দেশের উন্নতি করেছিল। গ্রামেরও উন্নতি হয়েছিল। তবুও ফ্রান্সের গ্রামগুলি তেমন উন্নত ছিল না। এমন-কি ইংল্যান্ডের গ্রামের অবস্থা ফ্রান্সের গ্রামগুলির চেয়েও উন্নত এবং পরিষ্কার। তবুও সৌখিন ভাবে বাস করতে হলে, থাকতে হয় ফরাসি গ্রামে। যারা প্যারির নাম নিয়ে বিলাসের কথা চিন্তা করেন, তাঁরা মহাভ্রান্ত। তাঁরা গ্রামেই যান এবং বলে থাকেন প্যারিতে ছিলেন। গ্রামগুলি ব্লক করে সাজানো। ফুটপাথের পরেই ছোট্ট বাগিচা। বাগিচায় অনেক রং-এর সুন্দর এবং গন্ধহীন চমৎকার ফুল দেখতে পাওয়া যায়। তারপর বাড়ি। বাড়ির মাঝে হোটেল এবং ক্লাব। কোথাও হোটেল এবং ক্লাব একসঙ্গে আছে। এই রকমের একটি হোটেলে আশ্রয় নিলাম। এখানে আমাকে বেশ সুন্দর একটি রুম দেওয়া হয়েছিল। রুমের সুন্দর বিছানা দেখেই মনে হচ্ছিল "এই রুমটাতে সারাজীবন কাটিয়ে দিই।" মাত্র দশ ফ্রাংক করে প্রত্যেকে রাত্রির জন্যে সজ্জিত রুমের ভাড়া দিতে হয়েছিল।

রুম ভাড়া করেছিলাম একটি মহিলার সঙ্গে কথা বলে। এদিকে ইংলিশ ভাষায় কথা বলতে পারে তেমন লোকের বড়ই অভাব। খুবই পরিশ্রান্ত ছিলাম। ঘামে ভিতরের শার্ট ভিজে গিয়েছিল। এইরকম অবস্থায় শরীরের উত্তাপে কামিজ শুকালে গায়ে উকুন হয়। সেজন্যে শার্ট বদলাতে হয়েছিল। শার্ট থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে বুঝতে পেরে মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, "দ্বিতীয় শার্ট আছে কি?" মহিলাকে শার্ট বদলাবো

ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বললেন, "শার্ট খুলে আলাদা জায়গায় একপাশে রেখে দেবেন, হোটেলওয়ালাকে বলে আজই ধুইয়ে রাখব।" হোটেলওয়ালা এসেছিল এবং দুর্গন্ধযুক্ত কামিজটাকে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একটুও ঘৃণা প্রকাশ করেনি।

এসব হয়ে যাবার পর ভাবছিলাম ইউরোপে এই একটিমাত্র দেশ আছে যে দেশে মানুষের বর্ণের ওপর একটুও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। স্পেন, পর্তুগাল, গ্রেটব্রিটেন, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, জার্মানি, ইটালি, সুইজারল্যান্ড সর্বত্র মানুষের রং-এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। ফ্রান্সে সে রকম কিছুই নেই, কেন নেই নিশ্চয় বিবেচ্য বিষয়। ইংল্যান্ডের ডেমোক্রেসির শত প্রসংসা করা হোক সেখানেও কালার-বার রয়েছে। হল্যান্ড কালার-বারের জন্মস্থান। হল্যান্ড দেশটি ছোট্ট হলেও দুষ্ট লোকের অভাব নেই।

ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদ জঘন্য, কনস্পিরেসি করা ফরাসিদের যেন জন্মগত অভ্যাস। ঠগবাজ, জালিয়াত, ফাঁকিবাজ লোক ফরাসি দেশে যত দেখা যায়, অন্য কোনো দেশে তত দেখছি বলে মনে হয় না, তবুও এই দেশের লোককে তাদের ভদ্র ব্যবহারের জন্য প্রশংসা করতে হয়।

একটু আগে যে হোটেলের কথা বলা হয়েছে, সেই হোটেলের মালিক আমার শরীরের রং-এর প্রতি কোনো রকম আপত্তিকর গুরুত্ব দেয়নি। হোটেলে এসেছেন থাকুন; আপনি কোন জাত? আপনার শরীরের বর্ণ কালো কেন? এসব প্রশ্নই উঠে না, শুধু প্রশ্ন উঠে, 'হোটেলে থাকার অর্থ আছে কি না?' ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে টাকার কথা মুখ্য নয়, মুখ্য শরীরের চামড়ার রং? গায়ের চামড়া সাদা না হলে টাকা থাকলেও ইংল্যান্ডে অনেক হোটেলে স্থান দেওয়া হয় না।

মাত্র দু-মাস আগে একটি সিংহলি পর্যটক আমার ঘরে এসেছিল এবং সে ইংল্যান্ড যাবে সেজন্যে ইংল্যান্ডের খুবই প্রশংসা করেছিল। তাকে প্রকাশ্যেই বলেছিলাম, "যে দেশের এত প্রশংসা করছ, একবার সে দেশে যাও বুঝবে তুমি কোন শ্রেণির জীব। তুমি একটি কালো প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নও, সে দেশের লোকের চক্ষে।" লোকটা ভয়ানক ইংলিশ ভক্ত। আমার কথা একটুও বিশ্বাস করেনি।

আজ যেখানে ১১২ নম্বর গাওয়ার স্ট্রিটের বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, তার ঠিক বিপরীত ফুটপাথে একটি হোটেল ছিল। এই হোটেলে অনেকবার থাকবার জন্যে চেষ্টা করেও কৃতকার্য হইনি। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসের কথা বলছি, ওয়াই-এম-সি-এর বাড়িতে প্রবেশ করেই দেখতে পেয়েছিলাম একজন সিংহলি পাদ্রি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরও মালপত্র হোটেলে চলে গিয়েছিল, তিনি যাবেন একটু পরেই সামনের হোটেলে। কৌতূহল হল— অনেকবার এই হোটেলে থাকতে চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হইনি অথচ এই কালো পাদ্রি এখানে কী করে স্থান পেল? এখানে পাদ্রি অথবা ধর্মের কথা মোটেই ওঠে না, দেখা যাক্ পাদ্রি স্থান পান কিনা? একটু পরেই সেই পাদ্রি হোটেলে গেলেন।

পাদ্রিকে দেখামাত্র হোটেলের ম্যানেজার বললেন, "এখানে একটি রুমও খালি নেই।"

ম্যানেজার পাদ্রি বললেন, "রেভারেন্ড নিকলসনের জন্য এখানে কোনো রুম ঠিক করা হয়েছে?"

হোটেলের ম্যানেজার এবার একটু চিন্তিত হয়ে পাদ্রিকে জবাব দিলেন, "তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না।"

পাদ্রি বললেন, "আমিই রেভারেন্ড নিকলসন।"

এবার ম্যানেজার নিজের স্বরূপ ধারণ করলে এবং বলল, "কী করে তুমি ইংরাজি ভাষা আয়ত্ত করলে? কী করে তুমি ইংলিশ নাম গ্রহণ করলে? যদি তুমিই রেভারেন্ড নিকলসন হও, তবে তোমার মালপত্র নিয়ে যেয়ো, এখানে কালো-চামড়াওয়ালাদের স্থান নেই?

এই পৃথিবীতে আত্মসম্মান জ্ঞান আছে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। নিকলসন ছিলেন আত্মসম্মানী, কাজেই তিনি নিজের নাম বদলে মুখা আইয়া রেখেছিলেন।

এই তো ইংল্যান্ডে কালো-চামড়াওয়ালাদের অবস্থা। প্যারিতে কিন্তু আলাদা, একদিন একটি নিগ্রোকে মাতাল অবস্থায় দেখেছিলাম। তার প্যান্টের বোতাম আঁটা ছিল না। কোথা হতে একজন ফরাসি এসেই সেই নিগ্রোর প্যান্টের বোতাম এঁটে দিয়ে নিগ্রোকেই মারসি মঁসিয়ে বলে চলে গিয়েছিল। মাতালের প্যান্টের বোতাম এঁটে দিয়ে সে মাতালকেই ধন্যবাদ দিয়েছিল। এক্ষেত্রে ফরাসিদের শত দোষ থাকা সত্ত্বেও তাদের এই একটিমাত্র গুণের জন্যে সব সময় ফরাসি জাতিকে অন্তত আমি শ্রদ্ধা করি।

কেন ফরাসিরা কালো-চামড়াওয়ালাদের সমান অধিকার দিয়েছিল সেই কারণ আমি জানি, কিন্তু সেই কারণে

ব্রিটিশজাতি কিন্তু ভারতবাসীদের এমন-কি গ্রিকদেরও সমান অধিকার দেয়নি।

পূর্বের বিষয়ে পুনরায় ফিরে যাওয়া চাই। ইতিমধ্যে অনেক নিকৃষ্ট ফরাসি হোটেলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। গ্রামের নিকৃষ্ট শ্রেণির হোটেলে খাব এবং থাকতে হবে এর কোনো মানে হয় না সেজন্য উত্তম হোটেলেও থাকতাম।

আমি যে হোটেলে ছিলাম সেটা নিকৃষ্ট ছিল না। সেটা ছিল উৎকৃষ্ট, সেজন্য রেঁস্তোরা ছিল না। বাইরে খেতে গিয়েছিলাম। বাইরে রেঁস্তোরা ছিল একটু নিকৃষ্ট রকমের। কম পয়সায় পেট ভরে খাওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। আমি রাজপুত্র অথবা সরকারি খয়ের খাঁ ছিলাম না, সেজন্যে ভিক্ষালব্ধ প্রত্যেকটি ফ্রাংককে হিসাব করে খরচ করতে হয়েছিল। বিদেশে গিয়ে যারাই অযথা টাকা খরচ করে, তাদের প্রতি কোনোসময়ে কেউ শ্রদ্ধা দেখাতে পারে না। অশ্রদ্ধার নানা কারণ থাকে। অ্যামব্যাসেডার অ্যাট লার্জ এই পদবি নিয়ে যাঁরাই ভিন্ন দেশে যান তাঁদের খরচ খুব বেশি। সাধারণ লোকও এই শ্রেণির লোককে ঘৃণা করে। আমাদের দেশের লোক এখনও সেই শ্রেণির লোককে চিনতে পারে না। এই প্রকারের লোককে উদার বলেই গণ্য করা হয়। আমাদের দেশে আরও একটু রাজনৈতিক জ্ঞান পরিস্ফুট হোক, তখন লোকে বুঝতে পারবে সে কোন শ্রেণির লোক? তখন বাজে লোকের কাছেও পলিটিক্যাল পর্যটকেরা স্থান পাবে না।

রেস্তোরাঁ থেকে ফিরে এসে দেখলাম হোটেলের বার লোকে লোকারণ্য। সেখানে কেউ হুইস্কি, কেউ ব্রান্ডি, কেউ ভিনো পেট ভরে খাচ্ছে। এই তিনটি পানীয়কে স্পর্শ করতাম না। শরীরের রক্ত শুষে ফেলবে, এই ভয়েই এসব থেকে দূরে থাকতাম। শরীরের রক্ত রোজই জল হত, তার ওপর যদি মদ খেতাম তবে পথ চলাই কষ্টকর হত। পর্যটকের পক্ষে আহারে-বিহারে সংযম একান্ত দরকার। পর্যটন আরম্ভ করে যিনি মতিভ্রষ্ট হন তিনি মাঝদরিয়ায় নৌকো ডুবিয়ে ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হন এবং মিথ্যার বেসাতি করতে প্রবৃত্ত হন। সুখের বিষয়, এই শ্রেণির পর্যটকের নাম অথবা তাঁদের পুস্তকের কোন সময়েই গুরুত্ব হয় না। মাতালের মন উদার একথা সব সময়ে সত্য নয়, বিশেষ ধনীদের দ্বারা পরিচালিত এই হোটেলে যারা মদ খাচ্ছিল, তাদের মধ্যে সবাই ছিল ধনী। এদের প্রত্যেককে একটি করে ভিক্ষা-পত্র দিয়েছিলাম। অনেকেই সন্দেহপূর্ণ ভাষায় আমাকে নানা রকমের প্রশ্ন করছিল। শেষে একজন জিজ্ঞাসা করলে, "এত দেশ যে ভ্রমণ করেছেন তার প্রমাণ কি?" প্রেস-কাটিংগুলো এবং অটোগ্রাফ-বই সঙ্গেই ছিল। বই দুটো সামনে ফেলে দিয়ে এক দিকে দাঁড়িয়ে এক ড্রাম ব্রান্ডি দিতে বলাতে বারম্যান অবাক হয়েছিল। ষাট ফোঁটা ব্রান্ডিতে নেশাও হয় না, মুখেও লাগে না। বারম্যান আমার আদেশ অবহেলা করলে না। এক গ্লাস জলের সঙ্গে ষাট ফোঁটা ব্রান্ডি খাওয়া দেখে অনেকেই অবাক হয়েছিল। এতে কিন্তু বেশ উপকার হয়েছিল। যে লোকটি অটোগ্রাফ-বই এবং প্রেস-কাটিং দেখেছিল সে আমার ভ্রমণের সঠিক প্রমাণ বুঝতে পেরে, অন্যান্য সকলের কাছ থেকে একশত ফ্রাংক চাঁদা উঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

জার্মান টুরিস্টরা ইউরোপের সর্বত্র চলাফেরা আরম্ভ করেছিল। ভিক্ষা করে তারা নিজেদের খরচ চালাত। রাত্রে তারা থাকত হোটেলে, খেত রেঁস্তোরায়। ব্রিটিশ টুরিস্টও এখানে কম ছিল না। তারাও জার্মান টুরিস্টদের মতো ভিক্ষা করেই খরচ চালাত। দুঃখের বিষয়, ফরাসি টুরিস্ট মোটেই দেখা যেত না। জার্মান টুরিস্টরা পর্যটন করত শরীরের সহনশীলতা বাড়াবার জন্য। ব্রিটিশ টুরিস্টরা কনটিনেন্ট ভ্রমণ করত জ্ঞান অর্জনের জন্য। ফরাসি টুরিস্ট যে দু-একজন দেখা যেত না তা নয়, তবে তারা ছিল আত্মকেন্দ্রিক এবং তাদের গতি ছিল ক্রমেই দূর দূরান্তরে এবং সেজন্যই ফরাসি জাতের মধ্যে যে সব পর্যটক দেখেছিলাম তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বিদেশে!

একশত ফ্রাংক পকেটস্থ করার পর বারে বসে থাকতে ইচ্ছা হয়নি, নিজের রুমে যাওয়া ভালো হবে মনে করছিলাম। পূর্বেই বলেছি এটা গ্রাম। সাধারণত গ্রামে ধনী এবং মধ্যবিত্তশ্রেণির লোকের সংখ্যা শতকরা নিরানব্বই জন, সেজন্যে এখানে দুর্নীতি বেশি। এক-তরফা ধনদৌলতের সঙ্গে ব্যভিচারের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গি। ধনী লোকের লালসা অতীব প্রবল। কিবা রাত কিবা দিন এরা যে কী করে, যদি বুঝতে হয় তবে সামান্য কথায় বলছি, ফ্যাকাশে মুখ, কুটিল হাসি এই প্রকারের নিদর্শনের কথা বলা যেতে পারে, এর বেশি নয় কারণ এটা ভ্রমণ কাহিনি। এতে কুৎসিত কথা লেখা যায় না। সেজন্যে সুরুচির অনুরোধে নোংরা ব্যাপারের

উল্লেখ এখানে পরিত্যাগ করা হল। বর্তমানে প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশ ব্রিটিশ কথিত ফ্রান্সের পর্যায়ে এসেছে।

মজার বিষয় হল, বড় বড় শহরে দরিদ্রের বাস। বড় বড় শহরের আশেপাশে কলকারখানা থাকে। মজুররা মজুরি করে এবং সেখানে থাকে। এখানে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, ভারতীয় মজুরের সঙ্গে পশ্চিম-ইউরোপের কোনো সম্পর্ক নেই। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে আর্থিক উন্নতিতে পশ্চিম-ইউরোপের মজুরের সঙ্গে ভারতীয় যে কোনো পরিবার, যাদের আয় মাসে তিনশত থেকে চারশত টাকা, তাদের সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায়। ১৯৩৫ সালের শেষ ভাগের ভ্রমণ-কাহিনি এখানে লেখা হয়েছে! হয়তো অনেকে বলবেন, বর্তমানের সঙ্গে ১৯৩৫ সালের শেষ ভাগের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। খবর নিয়ে জেনেছি, **১৯৩৫** সালে ফ্রান্সে যে অবস্থা ছিল, বর্তমানেও ঠিক সেই অবস্থা। একটুও বদলায়নি; আমাদের পরিবর্তন দেখে যেন কেউ মনে না করেন ফরাসি দেশেও মাখনের সঙ্গে ময়দা মেশানো হয়, পনিরের সঙ্গে আটা মেশানো হয়। খাদ্যবস্তুতে অখাদ্য ভেজাল দেওয়া শুধু আমাদের 'আধ্যাত্মিকতার' দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। সারা দুনিয়ার আর কোনো জায়গায় জাতির স্বাস্থ্যনাশকারী এমন জঘন্য মনোবৃত্তি কারো নেই।

এর পরে কোনো গ্রামে না থেকে খামারে অথবা শহরে থাকাই মনস্থ করেছিলাম। পরের দিন পথ চলতে চলতে সামনে মস্তবড় একটি শহর পড়ে। তার নাম হল কোয়েনতিন (Quentin)। এদিকে আমার আসবার কারণ ছিল। কোয়েনতিন থেকে প্যারি পর্যন্ত সর্বত্র উৎরাই। একটু চড়াই ঠেলে যদি ভালো উতরাই পাওয়া যায় তবে ক্ষতি কি? এত বড় শহরটাতে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। খাঁটি কথা হল, শহরে থাকলে খরচ বেশি হয় আর গোলাবাড়িতে থাকলে খাওয়া ভালো তো পাওয়া যায়, উপরন্তু শান্তিতে থাকা যায়। গোলাবাড়ির লোকে কোনো রাজনৈতিক ব্যাপারের আলাপ-আলোচনা করে না। শহরে একটু যারা পড়তে পারে তারা সস্তা-দামের সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকা পড়তেই পছন্দ করে। মজুরদের দৈনিক পত্রিকাগুলো বেশ সস্তা। বিদেশী সংবাদে ভর্তি, সেই সঙ্গে থাকত 'মজুরসংবাদ'। আমিও 'ডেলি টেলিগ্রাফ' নামে একটি ইংলিশ দৈনিক পত্রিকা এক ফ্রাংক দিয়ে কিনলাম। আরাম করে শুয়ে থাকতে হলে গোলাবাড়ি সবচেয়ে ভালো জায়গা। তা ছাড়া পুলিসের টানা-হ্যাঁচড়া থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। 'রক্ত খেকো ধূর্ত পেতনি'দের সঙ্গে মোটেই দেখা হত না। 'রক্ত খেকো ধূর্ত পেতনি' কাকে বলে এখানে বলা হল না, এসব বাজে কথা ভ্রমণ কাহিনিতে স্থান না পাওয়াই ভালো।

সেদিন বিকালে পথের পাশে একটি গোলাবাড়ি দেখে সেখানেই থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল। 'ডেলি টেলিগ্রাফ' এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ডেলি মিরার' কাগজ শহর থেকে কিনে নিয়েছিলাম। কোনো গোলাবাড়িতে একদিন থেকে এই দুখানা সংবাদপত্র ভালো করে পড়ে নিয়ে প্যারি এবং লন্ডন দেখার জন্য প্রস্তুত হব, এই ছিল উদ্দেশ্য।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। পশ্চিম আকাশে তখনও আলো ছিল। রোদ আরামপ্রদই ছিল। আকাশে সূর্য ছিল না। দেড় ঘণ্টা আগে অস্ত গিয়েছিল। তবুও সূর্যের আলো দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? আকাশে সূর্য নেই, অথচ সূর্যের আলো বেশ দেখতে পাওয়া যায়, এরকম অবস্থা যদি আমাদের দেশে হয়, তবে মুসলমান বলবে 'আল্লার কুদরত', হিন্দু বলবে 'নিশ্চয়ই রসাতল', কিন্তু ইউরোপের বৈজ্ঞানিক বলবে 'এটা পৃথিবীর দক্ষিণায়ন'। যা আমরা জানি না অথবা জানতে চেষ্টাও করি না তা-ই হয় 'রহস্য' এবং 'ঈশ্বরের ইচ্ছা'। বিষয়টা ঠিকভাবে জানতে পারার পরে কোনো রহস্যও আর 'রহস্য' থাকে না। রহস্য ততক্ষণই 'রহস্য' থাকে যতক্ষণ তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের যুগে রহস্যবাদ অন্ধবিশ্বাস ও যুক্তহীনতা ক্রমেই লোপাট হয়ে যাচ্ছে।

জীবিত ও উন্নতিশীল জাতির প্রাণশক্তির লক্ষণই হল— সমস্ত ব্যাপারকেই খুঁটিনাটি করে জানবার প্রবল ইচ্ছা ও চেষ্টা। আর যে জাত ধ্বংসোন্মুখ ও জড়তাপ্রাপ্ত, সেই জাতেরই মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা নেই। নতুন নতুন ভাবে সত্যকে জানবার আকাঙ্ক্ষা সে জাতির মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীর অন্য সব জাতি কর্মশক্তি ও মননশীলতার দিক দিয়ে কেবলই এগিয়ে চলেছে, সে চলার শেষ নেই। অলস মুমূর্ষু জরাগ্রস্ত জাত আপনার অচলায়তনে চুপচাপ বসে থাকে। কোনো নূতন ব্যাপারকে দেখবার ও জানবার ও বুঝবার আগ্রহ তাদের মোটেই থাকে না। অজ্ঞানতার জন্যে তাদের মধ্যে বড়াই ও অহংকার থাকে "আমরা সবই জানি

আমাদের শেখবার বা জানবার মতন বিষয় পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।" আমাদের দেশের লোক সেই প্রকৃতির।

এরোপ্লেন আবিষ্কার হল, অমনি আমাদের দেশের লোকে বলতে আরম্ভ করলে, আমাদের দেশেও পুষ্পক রথ ছিল, ইউরোপিয়ানরা এমন-কি নূতন দেখালে! যা-ই আবিষ্কার হোক আমাদের দেশে সবই ছিল নূতন কিছুই নয়। আরবরাও বলে তাদের দেশের সবই ছিল, যা কোরানে নাই তা কোথাও নাই এবং হতেও পারে না।

আমি যে গোলাবাড়ির কাছে এসেছি, তার চারিদিকে হে-ঘাস শুকাবার জন্য দেওয়া হয়েছিল। ঘাসের সুব্যবস্থা না করলে শীতের সময় গরুতে খাবে কী? ইউরোপেও সর্বত্র যদিও গোমাংসের প্রচলন, গরু যদিও তারা হত্যা করে তবুও যে কয়টি গরু তারা বাঁচিয়ে রাখে সেই গরু যে যত্ন পায় আমাদের হসপিটালের রোগীও তত যত্ন পায় না। গোলাবাড়ির সামনে কাউকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু চমৎকার করে সাজানো একটি হে-ঘাসের স্তূপ দেখতে পেলাম। হে-ঘাসই গরুর আসল খাদ্য। হে-ঘাসের স্তূপটা দেখবার জন্যে ঘরটার পেছন দিকে চলে গেলাম। কাছে যাওয়া মাত্র বেশ মিষ্টি গন্ধ অনুভব হল। মনে হচ্ছিল, এক সপ্তাহ আগে হয়তো স্তূপ সাজানো হয়েছিল। কাছেই একটা গাই ঘাস খাচ্ছিল। গাইটার জাত দেখে মনে হচ্ছিল— বোধ হয় উত্তর জার্মানি থেকে গাইটা এদেশে আনা হয়েছে। দূরে আরো অনেকগুলি গরু ঘাস খাচ্ছিল। তখন মাঠে ঘাসের অভাব ছিল। শীত প্রায় এসে পড়েছিল, সেজন্যে মাঠের ঘাস শুকিয়ে যাচ্ছিল।

বাড়িটা অনেকক্ষণ দেখার পরেও কোনো লোকের সাড়া পাচ্ছিলাম না। কাউকে না দেখতে পেয়ে ঘরের ভেতর কেউ আছে কিনা দেখতে চেষ্টা করলাম। ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না। খানিকক্ষণ পরে ঘরের পেছন দিক থেকে একটি যুবতী বেরিয়ে এলেন। যুবতী-যুবতীই, তাঁর শরীরের রং অনেকটা সাদা। 'অনেকটা সাদা' একথা বলার মানে আছে। আমরা সকল ইউরোপিয়ানকেই 'শ্বেতকায়' বলি। আসলে বিষয়টা একেবারে ভুল। ইউরোপে 'ব্লু-ব্লাড' বলে একটি শব্দের প্রচলন আছে, 'ব্লু-ব্লাড' বলতে আসলে কোনো রকমের রক্ত নেই। যাদের শরীরের চামড়া দুধের মতো সাদা, তাদের নাড়ি দেখা যায় এবং দেখতে নীলবর্ণ দেখায়। এসব লোককেই ইউরোপের লোকে 'শ্বেতকায়' বলে। এই যুবতীর শিরাগুলি দেখা যাচ্ছিল না। তাঁর শরীরে প্রচুর রক্তমাংস থাকাতে রক্তিমাভ দেখাচ্ছিল। গাল দুটো যেন বড় বড় দুটো আপেল। চুল সোনালি, চোখ উজ্জ্বল এবং চোখের তারা গাঢ় নীল। কোমর সরু। হাত চওড়া এবং শক্ত। দেখলেই মজুর শ্রেণির মেয়ে বলে মনে হয়। পা শক্তিশালী অথচ পাতলা। মুখে কঠোরতা ফুটে বের হচ্ছিল।

এই প্রকারের যুবতী সাধারণত মজুর শ্রেণির পরিচালক হয়। যুবতীকে দেখে আমার কিছুই অদ্ভুত মনে হচ্ছিল না। আমাকে দেখামাত্র যুবতী কী জিজ্ঞাসা করছিলেন তার কিছুই বুঝতে পারিনি। তিনি কোন ভাষায় কথা বলছিলেন তা অনুভব করতে সক্ষম হইনি। আমি কিন্তু আমার কথা ইংলিশেই বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। "থাকতে চাই আর খেতে চাই এবং সেজন্যে যা খরচ লাগবে তাও দিতে প্রস্তুত।" আমার কথা বোধ হয় যুবতী কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন তবে চিন্তা করছিলেন যেন, তাঁকে চিন্তিত দেখে তাড়াতাড়ি পাঁচ ফ্রাংকের একখানা নোট বের করে দিলাম। যুবতী নোটখানা না নিয়ে বারান্দায় বসতে বললেন এবং কোথায় বসতে হবে তাও দেখিয়ে দিলেন। কতক্ষণ পরে যুবতী আমাকে এক পেয়ালা কাফি খেতে দিলেন। কাফিতে প্রচুর পরিমাণে ধন দুধ থাকায় শরীরটাতে তাড়াতাড়ি শক্তি ফিরে এসেছিল।

সূর্য অস্ত গেল। পশ্চিমের আকাশ বেশ লাল হয়ে উঠল। উত্তরে আকাশ থেকে ক্রমেই একটি নির্মল জ্যোতি আকাশ ঢেকে ফেলছিল। কতক্ষণ পরে সোনালি সূর্যকিরণ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। অন্ধকারের পরিবর্তে সূর্যকিরণ রাত্রির আগমন জানিয়ে দিল। বেশিক্ষণ বারান্দায় বসে থাকতে ইচ্ছা হল না। একটু বেড়াতে ইচ্ছা হল। মাঠের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম যুবতী একটা গর্ত খুঁড়ছেন এবং বড় বড় মাটির চাপড়া ওঠাচ্ছেন। গর্ত খোঁড়া হয়ে গেলে ঘুরে ফিরে এসে ঘরের পেছনের নর্দমা থেকে জঞ্জাল উঠিয়ে গর্তে ঢালতে আরম্ভ করলেন। জঞ্জাল ছিল দুর্গন্ধে ভর্তি। তাতে কত কিছু ময়লা ছিল কে জানে? দুর্গন্ধের জন্যে মাঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না। অনেক বালতি জঞ্জাল নিয়ে যাবার পর যুবতী দুর্গন্ধযুক্ত হাতে ঘরে ফিরলেন। আমি পূর্বেই বারান্দায় ফিরে এসেছিলাম। যুবতী যখন ঘরে ফিরছিলেন

তখন তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম বের হচ্ছিল।

যুবতী ঘরে এলেন এবং গরম জলে দেহকে পরিষ্কার করে সুগন্ধযুক্ত সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলেন। এইটা হল ফরাসি সভ্যতা। ইংলিশ, স্কচ, ডাচ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জাতের লোক শুধু সাবান দিয়েই হাতমুখ ধুয়ে নেয়, সুগন্ধযুক্ত সাবান ব্যবহার করে না।

খানিক পরে যুবতী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই আমাকে বললেন, "তবে কি মঁসিয়ে ব্রিটিশের প্রজা?" হ্যাঁ, না কিছুই বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, শুধু বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা লেগেছিল। কোনো বিদেশী জাতের প্রজা বলে নিজের পরিচয় দেওয়া কত লজ্জা ও গ্লানির বিষয় সে ব্যাপারটা যারা বিদেশে যায় না তারা বুঝতে পারে না।

স্বাধীনতা পাবার পূর্বে আমাদের দোষ সকল দিক দিয়েই প্রকাশ পেত। এখন স্বাধীন হয়েছি, হয়তো দোষ শুধরাতে সক্ষম হব। যুবতী স্বাধীনতার কথা নিয়ে যেমন বিপদে ফেলেছিলেন, তেমনি সাংহাই নগরীতে একটি চিনা দোকানি আমাকে বেশ শিক্ষা দিয়েছিল। সাংহাই নগরীতে একদিন আমি এবং মিনন নামে একটি লোক কোনো দোকানে মাখন কিনতে যাই। মাখনের দোকানে দুই রকমের মাখন ছিল। একটি খাঁটি অন্যটি নকল। আসল এবং নকল মাখন নিয়ে যখন আমরা তর্ক-বিতর্ক করছিলাম, তখন চিনা মাখনওলা আমাদের বলছিল, "তোমাদের নিজস্ব কোনো ভাষা নেই বোধ হয়, সেজন্যই ইংলিশ বলছ?" চিনা দোকানিকে আমি জবাব দিতে সক্ষম হয়েছিলাম, কিন্তু তাতে দোকানি সুখী হতে পারেনি। সে বলছিল, "আমাদের (চিনাদের) লেখ্য ভাষা সমগ্র চিন, কোরিয়া এবং জাপানের লোকের কাছে পরিচিত। মান্দারিন, কথ্য ভাষা বর্তমানে লেখ্য ভাষার স্থান নিতে আরম্ভ করেছে, তোমাদেরও সেরকম একটি ভাষা সাধারণ ভাষা রূপে গ্রহণ করা কর্তব্য।"

মাখন কিনে ফেরবার পথে আমি এবং মিনন রোমান হিন্দুস্থানী ভারতের সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণ করেছিলাম এবং বিদেশে কোনো ইন্ডিয়ানের কাছে যখনই পত্র দিতাম তখনই রোমান অক্ষরে হিন্দুস্থানিতে লিখতাম। কিন্তু টেন্ডন, রাজেন্দ্রপ্রসাদ শ্রেণির লোকের বিরোধিতায় এবং মহাত্মা গান্ধীর "to please everybody" নীতিতে আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা বর্তমানে বাতিল হলেও ভবিষ্যতে জ্ঞানী এবং বুদ্ধিজীবীরা গ্রহণ করবেন। ভাষাসাম্রাজ্যবাদীদের পতন অনিবার্য। কোনোমতেই ফ্যানাটিকদের কেউ প্রশ্রয় দেবে না। মহাত্মা গান্ধী নাকি বলে গেছেন হিন্দি এবং উর্দু উভয় অক্ষরই শিখতে হবে। তিনি হয়তো বুঝতে পারেননি, ভবিষ্যতের ভারতীয় জনসাধারণ তাঁর এই উপদেশটি মেনে চলবে না। দুটো অবৈজ্ঞানিক লিপি শেখবার ইচ্ছা হবে শুধু ভাষাতত্ত্ববিদদেরই, কারণ ওঁদের গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য শেখা একান্তই দরকার হবে।

যা-ই হোক, এখন ফ্রান্সে আমার প্রবাস-কাহিনির কথাই আবার বলছি। আরও কতক্ষণ পরে যুবতী আর এক পেয়ালা কফি দিয়ে বললেন "তবে আপনি ইংলিশ?"

"না মাদাম, আমি ইংলিশ নই, একজন হেঁদু, (ইন্ডিয়ার বাসিন্দা)। অতি কষ্টে একটি মাত্র বিদেশি ভাষা শিখতে সক্ষম হয়েছি। আপনাদেরও অনেক কলোনি আমাদের দেশে আছে, যেমন পণ্ডিচেরি, চন্দননগর ইত্যাদি। যারা আপনাদের কলোনিতে বাস করে তারা আপনাদের ভাষাই শেখে।"

এবার যুবতীর একটু দুঃখ হল। অবশ্য আমার দরদে যুবতী দরদি হননি। তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন এই জন্যে যে আমি কেন তাঁদের কলোনিতে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি যদি তাদের প্রজা হয়ে এবং ফরাসি ভাষায় কথা বলে পৃথিবী ভ্রমণ করতাম, তবে সেই যুবতীর কত আনন্দ হত। এসব কথা বলতে যুবতীর একটুও বাধেনি। আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। ভাবছিলাম এর বাড়ি থেকে তখনি চলে যাই। অবশেষে বলতে বাধ্য হলাম, "সাম্রাজ্যবাদীরা শীঘ্রই আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। পৃথিবীতে যত কলোনি আছে সবই একদিন শ্বেতাঙ্গদের কবল থেকে মুক্ত হবে।"

এবার যুবতী একেবারে চুপ মেরে গেলেন এবং বললেন "মসিয়ে পলিটিকো"? অর্থাৎ 'মহাশয় কি রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের লোক?' তারপরই বললেন তাঁর মা বাবা এখনই ঘরে আসবেন, তাদের জন্যে রান্না করতে হবে। যুবতী ঘরের ভেতর গেলেন। দূর থেকে আলু এবং বাঁধাকপি সিদ্ধের গন্ধ পেয়েছিলাম। সেই গন্ধ কত সুমিষ্ট শুধু ক্ষুধার্তই বুঝতে পারে।

পাহাড়ের অপর দিক থেকে তিনজন লোক আসছিল, পরে আরো একজন লোক তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

দেখলেই মনে হয়, লোকটি ভাড়াটে মজুর। চারজনেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘরের ভেতরে চলে গিয়েছিল। গরম জল তৈরি ছিল। বেসিনে করে গরম জল এনে সকলেই স্ট্যান্ডের ওপর রেখে মুখ হাত ধুয়ে ফেললে। কিন্তু কেউ পা ধুলে না। ইউরোপে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সামনে পা পরিষ্কার করে না। এতে নাকি পুরুষের বড়ই ঘৃণা হয়। অতএব গৃহিণীর পা-ধোয়া সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অথচ আমাকে হাতমুখ ধুতে জল দেবার পর হাতমুখ ধুয়ে বাকি জল দিয়ে পা ধুয়েছিলাম। এসব বিষয়ে কারো মুখের দিকে কখনো চেয়ে থাকতাম না।

এদের বিশ্রাম করবার সময়ে, যুবতী তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কতক্ষণ পরে একটি লোক জিজ্ঞাসা করলে, আমার মুখ এত মসৃণ কেন? আমি কি কোনো রকমের তৈলাক্ত পদার্থ মুখে লাগাই? ভ্রমণের সময় সাবানও ব্যবহার করবার মতো সুযোগ হতো না। লোকটিকে শুধু জানিয়ে দিলাম, তার প্রশ্নের উত্তরে শুধু 'না' শব্দই ব্যবহার করা চলে। এতে সকলেই অবাক হয়েছিল। তারা জানতো না যে, আমার শরীরে তিনটি রক্তের সমাবেশ ছিল এবং সেজন্যেই সহজে কেউ বয়স বুঝতে পারত না।

যে লোকটি আমার সঙ্গে কথা বলছিল তার ইংলিশ বলার কায়দা অনেকটা ইংলিশদের মতো। জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিলাম Man (ম্যন) দ্বীপে সে অনেক বৎসর ছিল এবং সেখানেও ইংলিশ মজুরদের সঙ্গেই কাজ করত। ম্যন দ্বীপকে সে ভারি পছন্দ করে। তার ইচ্ছা সুবিধে পেলেই সে আবার ম্যন দ্বীপে ফিরে যাবে।

নানা বিষয়ের বই পড়ার চর্চা ইউরোপের সকল শ্রেণির লোকদের মধ্যে বেশ প্রবলভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। ধনী-মানী, বিদ্বান থেকে আরম্ভ করে কলকারখানার মিস্ত্রি মজুর কারিগর কিংবা রাস্তার ফেরিওয়ালা পর্যন্ত এবিষয়ে প্রায় সকলেরই সমান উৎসাহ। অবশ্য প্রত্যেক দেশে কতক লোক থাকে তারা শুধু টাকা রোজগার, খাওয়া, ঘুম, আড্ডা, ইয়ারকি, হইচই করে জানোয়ারের মতো জীবন কাটায়। আমাদের দেশের লোকের মধ্যে পড়াশুনার চর্চা খুবই কম। যাঁরা নানা রকম বিষয়ে পড়াশুনা নিয়ে আজীবন থাকেন ভারতবর্ষের বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় তাঁরা খুবই অল্প। 'ধর্মশাস্ত্র' পড়াই আমাদের দেশে রেওয়াজ। বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, শিল্পকলার বই বাংলা দেশে খুব কম লোকই পড়েন। কতকগুলি বাজে হালকা নভেল নাটক পড়াই আমাদের বাঙালি জাতের মধ্যে প্রধানত দেখা যায়। সিরিয়াস কোনো বিষয় পড়বার মন উৎসাহ ও ধৈর্য, আমাদের মধ্যে একেবারেই কম, হাজারে একজনও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ইউরোপের লোকও বই পড়ে বটে, কিন্তু তাদের পুস্তক যেমন দুরূহ বিষয় নিয়ে রয়েছে তেমনি আছে হালকা বিষয় নিয়ে। হালকা বিষয় লেখার মতো বিষয়বস্তু তাদের ছিল এবং আছে, আমাদের ছিল না এবং বর্তমানেও নেই। ইউরোপের চোর, ডাকাত, গোয়েন্দা, পর্যটন কাহিনি কিছুরই অভাব নেই। এই তো হালে আমরা স্বাধীন হয়েছি, এখন আমাদের দেশেরও আর কিছু না হোক অ্যাডভেঞ্চারকারী হবে, যাদের কথা লিখতে পারা যাবে এবং সেই সঙ্গে পারা যাবে অ্যাডভেঞ্চার এবং হালকা নভেলের সৃষ্টি করতে। লন্ডনের পরিবর্তে কলিকাতা, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পরিবর্তে লালবাজার বসিয়ে দিয়ে হালকা নভেলের সৃষ্টি করা যায় না।

ফ্রান্সে সাধারণ লোকদের ইতিহাস পড়ার তত ছাড় নেই কিন্তু ভৌগোলিক তথ্যপূর্ণ পুস্তকের বহুল প্রচার দেখা যায়।

তিনজন পুরুষই পাইপ মুখে দিয়ে যে-যার বই পড়তে আরম্ভ করেছিল। ইউরোপে বয়স্ক পুত্র পিতার সামনে তামাকের পাইপ অথবা সিগারেট খেতে পারে এবং দরকার হলে মদের গ্লাসের মাধ্যমেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। ইউরোপে আরব সভ্যতার আঁচড় পড়েনি, এটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের দেশেও সর্বত্র আরব সভ্যতার ছাপ পড়েনি। যেখানেই দিল্লির সম্রাটদের প্রভাব কম পড়েছিল সেখানেই পিতা পুত্রে একত্রে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করতে দেখতে পাওয়া যায়।

খাওয়া শেষ হবার পর মা এবং মেয়ে বাসন মাজতে লেগে গেলেন। বাসন-মাজা হয়ে গেলে বাসন মুছতে হয়। বাসন মোছা হবার পর এঁদের কেউ পুস্তকের শরণাপন্ন হলেন না। দুজনেই যে-যার বিছানায় চলে গেলেন।

আমাকে পৃথক বিছানা দেওয়া হয়েছিল। অনেকক্ষণ খবরের কাগজ পড়বার পরে আমিও বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

নির্দিষ্ট দিনে এই গোলাবাড়ি থেকে রওনা হলাম। এখান থেকে প্যারি শহর প্রায় সত্তর মাইল দূর। কাজেই পর পর

দুদিন প্যারির পথে ছিলাম। পথের মধ্যে প্রত্যেক দিনই গোলাবাড়িতে কাটিয়ে যে দিন প্যারিতে পৌঁছাব, সেদিন দেখা হয়েছিল আমার এক পূর্বপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে। এই লোকটি জাতে গ্রিক। ইনি বেশ ভালো ইংলিশ বলতেন। উপহাস করে প্রায়ই তিনি বলতেন, তাদের প্রজাবৃন্দকে দেখতে বের হয়েছেন। গ্রিকদের দেওয়া সভ্যতার আলোকে আলোকিত হয়েই আজ পাশ্চাত্য দেশের লোক সভ্য হয়েছে। তাঁর মতে তিনিও পূর্বদেশবাসী। তিনি যে পূর্ব দেশবাসী সে সম্বন্ধে পূর্বে অনেক কিছু বলা হয়েছে, সেজন্যে নতুন করে এখানে কিছুই বলা হল না। এই ভদ্রলোকই বারবার বলেছিলেন, প্যারিতে গিয়ে যেন 'সেলভে দু সেলুই' অর্থাৎ সালভেসন আর্মির বাড়িতে থাকি। ভদ্রলোকের উপদেশ মতো সেখানেই ছিলাম এবং সেখানে বেশ শান্তিতে ও আনন্দে কাটিয়ে ছিলাম কারণ, যাঁরা অতিথি কিংবা দর্শক হিসাবে সেখানে ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যথার্থ ভদ্র ও শিক্ষিত। তাঁদের মনও ছিল উদার। সাধারণ জগতের ছোটখাট নোংরা ব্যাপার থেকে তাঁরা একেবারেই দূরে থাকেন। নানা বিষয়ে তাঁদের গভীর পাণ্ডিত্য থাকায় তাঁরা যে সব কতাবার্তা আলাপ-আলোচনা করতেন, সে সবের মধ্যে অনেক কিছুই শেখবার ও জানবার বিষয় ছিল। এইসব লোকেদের সঙ্গে থাকলে সত্যই মন উন্নতি লাভ করে। যথার্থ শিক্ষায় ও জ্ঞানে মানুষকে সত্যই ভদ্র ও উদার ও মহৎ করে। অশিক্ষায় ও কুসংস্কারে মানুষকে একেবারে পশুর মতো অবনত করে দেয়। বিদ্যাহীন জ্ঞানহীন অমার্জিত লোকের সংসর্গ তাই নরকের মতন যন্ত্রণাপূর্ণ ও অশান্তিময়। জ্ঞানী, বিদ্বান ও মহৎপ্রকৃতি ব্যক্তির সংসর্গই স্বর্গ।

ফরাসি সীমান্ত থেকে এখান পর্যন্ত যতটুকু পথ অতিক্রম করতে হয়েছে সবটাই পর্বতাকীর্ণ। পর্বতগুলিও তত সুন্দর নয়। মধ্য ইউরোপের পর্বত দেখতে বেশ সুন্দর। সুইজারল্যান্ডের পর্বত এবং আমাদের দার্জিলিং-এর পর্বতমালা একই ধরনের। হঠাৎ এক ঝাঁকুনিতে যেন সমুদ্র গর্ভ থেকে আকাশের দিকে ছুটেছিল। উত্তর ফ্রান্সের পর্বতমালাও সেরূপ, সেজন্য বসতি খুব কম। মধ্য ফ্রান্সেও পাহাড়গুলি চ্যাপ্টা এবং নয়নাভিরাম। ❑

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

২০২৩ সালে পুরস্কৃত কবি মৃদুল দাশগুপ্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপনের সংক্ষিপ্তসার :

প্রশ্ন উত্তর পর্ব ঃ

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- মৃদুলদা, আপনার জন্ম হচ্ছে শ্রীরামপুরে, উত্তরপাড়া থেকে জীববিজ্ঞানে স্নাতক, প্রথমে শিক্ষকতা তারপর সাংবাদিকতা, পরিবর্তন যুগান্তর হয়ে এখন আজকাল পত্রিকায় অবসর নিয়েছেন। আপনার কাব্যগ্রন্থ আমি যতটা দেখিছে পদ্যপুরানে ৮টা। জলপাই কাঠের.....কবিতা সমগ্র।

মৃদুলঃ- ছড়া দিয়েই তো আমার লেখালেখি শুরু।

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- আপনি এখনও ছড়া লেখেন?

মৃদুলঃ-আমি এখনও ছড়া লেখি।

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- আপনার তো ছড়ার ৪টা বই বোধ হয়?

মৃদুলঃ- হ্যাঁ তাই।

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- আপনি তো গল্পও লিখেছেন?

মৃদুলঃ- হ্যাঁ, আমি ১২/১৪ টা গল্প লিখেছি।

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- আপনার তো গল্পের বই আছে?

মৃদুলঃ- এটা বছর তিনেক আগে বেরিয়েছে।

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- এখন আপনি গল্প লেখেন?

মৃদুলঃ- বছরে একটা দুটো গল্প লিখি।

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- আপনি একটা পত্রিকারও সম্পাদনা করেছিলেন 'বাইসন'?

মৃদুলঃ- হ্যাঁ।

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- সেই পত্রিকা কি এখনও আছে?

মৃদুলঃ- না নেই, দুটো সংখ্যা বেরিয়েছিলো। ওই জরুরি অবস্থার আগে বেরিয়েছিলো।

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- এবার সরাসরি ভাবে আপনার কবিতায় ঢুকে যাই। আপনি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন আপনি বলেছিলেন আপনি ৬০ এর দশকের কবি কিন্তু আমরা জানি আপনি ৭০ দশকের কবি।

মৃদুলঃ- ব্যাপারটা হল আমি ৬৮-৬৯ সাল থেকে লেখা-লেখি শুরু করি। আমি যখন অষ্টম ক্লাসে পড়ি তখন আমার একটি কবিতা কলকাতা লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। তখন সালটা ছিল ১৯৬৮।

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- আপনি যখন কবিতা লিখতে এলেন তখন কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর সময় কারণ এর পূর্বের দশকে মানে ৬০-এর দশকে...

মৃদুলঃ- এত বিস্তারিত ভাবে বলার দরকার নেই। ব্যপারটা হচ্ছে আমার বয়সে যারা, যাদের বয়স ষাটের উপরে হয়ে গেছে তাঁরা মোটামুটি ভাবে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ওই সময়টার। আজকে হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস, মানে আজকে ঘোষিত হয়েছিল স্বাধীনতার, বাংলাদেশ যে স্বাধীন তাঁর ঘোষণা হয়েছে। ৬৭-৬৮-৬৯ -এর সময় তখন নৃত্য করছিলো যেমন দেশভাগের সময়, সময় রুদ্র নাচন নাচাচ্ছিল আমাদের সময় ৬৯ এর সময় তখন নাচচ্ছিল। ফলে সেই নাচের কারণে ওই যে সময়ের আমরা আমাদের কবিতাতেও ওই নৃত্য ফুটে উঠল। আমার সময় সঙ্গীরা সবাই ছন্দিত, সবাই ছন্দ জানে সেটা আমরা সেই সময় থেকে পেয়েছিলাম।

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- আপনারা যখন লিখতে এসেছেন তখন কৃত্তিবাস আন্দোলন এবং হাঙরি আন্দোলন চলছে?

মৃদুলঃ- না আমরা যখন লিখতে এসেছি কৃত্তিবাসের আন্দোলন বলব না, হাঙরি আন্দোলনও বলব না এই ব্যাপার গুলো আসলে খুব মিইয়ে গিয়েছিল। এই জায়গাগুলো খুব মিইয়ে গিয়েছিল। কৃত্তিবাসের যদি মাথা বলতে হয় কৃত্তিবাসের মাথা তখন প্রতিষ্ঠানের দিকে ছুটছিল। আমাদের সময়টা হচ্ছে সেগুলো ভেঙে ফেলার মত্ত নাচন নাচার সময় শুরু হয়েছিল।

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- আপনিও একটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সেই আন্দোলনটির নাম হচ্ছে 'শত জল ঝর্ণার ধ্বনি'?

মৃদুলঃ- সেটা হচ্ছে লিটল ম্যাগাজিনের সম্মলিত মঞ্চ গড়ার একটি মুভমেন্ট। সেটা হচ্ছিল ৮০ দশকের শেষের দিকে।

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- "ভাব সেদিনের উৎসব বড়া নগরের গঙ্গার জল থেকে আবার এসেছে উঠে তিনশো তরুণ" (জলপাই ঘাটের সিরিজ থেকে)। আর একটি হচ্ছে ২০১১তে লেখা, কবিতার নাম হচ্ছে শোক গাথা. নেতাই গ্রাম লালগড় "বাতাসে বারুদ তাও প্রজাপতি উড়ে ফুল গাছ ভাবে বধূটি আসে না ভোরে, গীতালি আদোক পেটে দুটি গুলি গতকাল গেছে মরে শূন্য সাজিটি উঠনে রয়েছে পড়ে।" এই আমি আপনার দুটি কবিতা পড়লাম সেই দুটি কবিতায় যে বিশ্বাস, একটা জিনিষের প্রতি সমর্থন সেটা কি এখনও রয়ে গেছে?

মৃদুলঃ- না এটা ব্যপারটা হচ্ছে দুটোর কথা বলতে হয় বড়া নগরের তরুন যুবকদের নানাভাবে হত্যা করা হয়েছিল দুটো দিন ধরে যেখানে নিধন যজ্ঞ চলছিল, তরুণ ছেলেদের খুন করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা ঘটেছিল ওই সময়ের কবিতা। আর যে দ্বিতীয় কবিতা সেটা নেতাই গ্রাম আছে মেদিনীপুরে সেখানে গ্রামবাসীরা খাবারের দাবি জানাতে এসেছিল। ওই রেশনের রুটি খাবারের দাবি জানাতে এসেছিল। তাদের মাউবাদী বলে ভয় পেয়ে ছাদের উপর থেকে গুলি চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই গ্রামবাসীদের উপর। এই দুটো ঘটনায় লেখা। এখানে যে গণ মানুষদের উপর আক্রমণ বা যে ক্রোধ সেটা হচ্ছে যে ওইটার সময় তরুণ বয়সের ছিলাম, ৭২ সালে যখন ওই ঘটনাটা ঘটেছিল তখন আমি এই কবিতাটা লিখেছিলাম। আমার সমবয়সী সবাই মারা গিয়েছিল, আমাদের থেকে কিছুটা বড় যেমন ২৮-৩০ থেকে ১৬-১৭ বছরের ছেলেদের সব খুন করা হয়েছিল। সেটাই পীড়িত করেছিল, ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। এবার যে নিতাই গ্রামে যখন ঘটনা ঘটল তখন যে বয়স আমার সেটা তাকিয়ে থাকার বয়স বিবেচনার বয়স মানুষের উপর যে আক্রমণ, সাধারণ মানুষের উপর সেসব নিপীড়ন বর্বরতা সেখানে কবিরা প্রতিবাদ জানাবেই। এবার ঘটনা চক্রে ওই যে সময়টা তখন আমার তো বয়স হয়ে গেছে, তখন আমি 'সোনার বুদবুদের' কবিতা লিখি। সোনার বুদবুদে কবিতা লিখতে লিখতে যার ভাষা চারপাশের ভাষাও চেঞ্জ হয়। কবিতার নিবিড়তা আছে গভীরতা আছে। যে আমি যে কবিতা লিখেছি তখন আচমকা ওই ঘটনা ঘটেছিল তখন আমার সেই তরুণ বয়সের ক্রোধ লাফিয়ে উঠেছিল আমি ওইগুলো আলাদা একটা কবিতা হিসাবে ওই ধান খেত থেকে বইটা লিখেছিলাম।

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- আপনারা যখন লিখছেন তখন কলকাতা কেন্দ্রিকতাটা ভেঙে গেছে?

মৃদুলঃ- হ্যাঁ সেটা ভেঙে গেছে তা নানা ভাবে বোঝা যায়, এটা অনেকে বোঝে না কিন্তু। আজ দূরবর্তী যায়গায় যারা বসে আছো, যেমন কলকাতায় লিখতে পারলেই সিদ্ধি এই কথা যারা মনে করে আমরা অনেকেই সেটা ভেঙে দিয়েছি। আমি ফেসবুকে একটা লিখেছি কলকাতা বইমেলা প্রমাণ করে দিলো গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীর লেখাপত্র লিটিল ম্যাগাজিনে লেখা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বই সমস্ত বের করে ছোট ছোট প্রকাশক। মুদ্রায়ন এখন এমন যায়গায় পৌছেছে যে কম লোক নিয়েও তিনটি ছেলে একটি প্রকাশনা থেকে মহাগ্রন্থ বের করতে পারে। তার জন্য বলছি ছোট প্রকাশক এবং লিটল ম্যাগাজিন এখন একটি সিদ্ধির যায়গায় পৌছে গেছে। বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ বই অন্তত পশ্চিমবঙ্গের ছোট প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছে, লিটিল ম্যাগাজিনে গুরুত্বপূর্ণ লেখাপত্র বেরিয়েছে সেটা কলকাতার বই মেলায় প্রমাণিত হয়েছে।

শঙ্খ শুভ্র দেববর্মনঃ- এই সময়ে আমাদের উত্তরপূর্ব ভারতে সাহিত্য নিয়ে যারা চর্চা করছে তারা কিন্তু কেবল কলকাতা নয় সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের একটা আলাদা সত্তা হিসাবে দেখে উত্তর-পূর্ব ভারতের একটা স্বতন্ত্র বাংলা সাহিত্য ধারা হিসাবে দেখতে চেয়েছে..... ?

মৃদুলঃ- উত্তরপূর্ব একটা স্বতন্ত্র ভাষা যে বাংলাদেশের লোকরাও বলেছে এটা পশ্চিমবঙ্গের নয়, এটা বাংলাদেশের আর একটা ভাষা। এটার কিন্তু সাইকলজিক্যল দিক আছে। এই সাইকলজিক্যল দিকটা হচ্ছে আমরা স্বতন্ত্র এটা করছে নিজেদের অস্তিত্ব প্রদর্শনের জন্য যে আমরা আলাদা আমাদের গোটাই বাংলা ভাষা যদি বাংলায় লেখো। আমি উত্তরপূর্বাঞ্চলের অসমিয়া ভাষার কথা বলছি না, আমি কর্কবরক ভাষার কথা বলছি না, মানে আমি বলতে চাইছি আগরতলায় বসে যেই ছেলেটি বাংলা ভাষায় লিখছে আর শিলিগুড়ি বসে যেই ছেলেটি বাংলা ভাষায় লিখছে সে বাংলা সাহিত্যই করছে। ভাষার চেঞ্জ থাকতে পারে কিন্তু বাংলা ভাষায় করছে। এটা করছে অস্তিত্ব প্রদর্শনের জন্য যে

তুমি মিশে থাকতে চাইছো না যে তুমি মিশে থাকলে অনেকের মধ্যে একজন হবে, দশজনের মধ্যে একজন হবে। দশজনের ভেতরে একজন হওয়ার চেয়ে তিনজনের মধ্যে একজন হতে চাইছ যাতে প্রমিনেন্ট হও। গোটাটাই বাংলা ভাষা যে যে প্রান্তে লেখ না কেন।

শঙ্খ শুভ্র দেববর্মনঃ- তাই যদি হয় আঞ্চলিক সত্তাকে আমি এখানে সংকীর্ণ ভাবে ব্যবহার করতে চাইছি না ভৌগোলিক সত্তা, যেটা রয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের, সেই স্তর পেরিয়ে গেছে পরবর্তীকালে যে পোস্ট কলোনিয়াল লিটেরেচার আমেরিকা, কানাড়া, নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রলিয়া ওরা ইংরেজিতে সাহিত্য চর্চা করছে।

মৃদুলঃ- মূল কথাটা হচ্ছে ইংলণ্ডের মেইন ইংরেজি, না কি আমেরিকার ইংরেজি, ভৌগোলিক ব্যবধান আছে। ভৌগোলিক পরিবেশ প্রকৃতির আলাদা রকম ব্যপার আছে। তুমি যদি পূর্বাঞ্চল ভাবো পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসাম পর্যন্ত ভাবো এই যে সবুজ পূর্বাঞ্চল এই যে মাটির পূর্বাঞ্চল এই যে নদীমাতৃক পূর্বাঞ্চল-- রাষ্ট্র আলাদা হয়ে যাক রাজ্য আলাদা হয়ে যাক এই পূর্বাঞ্চলটা এক। একই ভূমির উপর আমরা রয়েছি। আমাদের পরিবেশ, প্রকৃতি, হাওয়া বাতাসে মিল আছে।

শঙ্খ শুভ্র দেববর্মনঃ- গো বলয়ে সংস্কৃতি যদি পশ্চিমবঙ্গে আসে অসুবিধা কোথায়?

মৃদুলঃ- গো বলয়ের সংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গে আসবে না কেন, এটা হচ্ছে রক্তের কারণে আসবে না। হাজার হাজার বছরের রক্তের ঐতিহ্যে আমরা যে বিরোধী জন এটা আর্যাবত্তের উল্টোদিকের আমরা মানুষ জন, এটা ইতিহাসে বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। ফলে আমরা রক্তের জন্য এটা মেনে নিতে পারবো না।

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- অনেক কবিতা আছে যেখানে কবিতার অংশ মিথ হয়ে গেছে। এই যে মিথ হয়ে যাওয়া কি কোনো কবিতার ক্ষতি করে?

মৃদুলঃ- হ্যাঁ, ক্ষতি করে।

সঞ্জয় চক্রবর্তীঃ- আপনি তো ভগবানকে বিশ্বাস করেন না বলেই জানি, এই যে পৃথিবীটা ঘুরছে সেটা কীভাবে হচ্ছে?

মৃদুলঃ- এইগুলোর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

এ-যাবৎ প্রদত্ত স্মারক বক্তৃতার বিবরণ

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা

বছর	বক্তা	বিষয়
২০১১	হরেকৃষ্ণ ডেকা	আধুনিক অসমিয়া কবিতার বিবর্তন
২০১২	বীরেন্দ্রনাথ দত্ত	অসমিয়া লোকগীতের বৈচিত্র্যের পটভূমিতে গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের অবস্থান ও গুরুত্ব : এক ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, লোক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিপাত
২০১৩	অমলেন্দু চক্রবর্তী	সমাজ-সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের অবদান
২০১৪	প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য	বোড়ো কবিতার ক্রমবিকাশ
২০১৫	শিবনাথ বর্মন	বেজবরুয়ার জাতীয়তাবোধ : ইয়ার বঙ্গীয় পৃষ্ঠভূমি
২০১৬	প্রসেনজিৎ চৌধুরী	অন্য এক জ্যোতিপ্রসাদ
২০১৭	নগেন শইকীয়া	অসমিয়া গদ্যের বিবর্তন

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

বছর	বক্তা	বিষয়
২০১১	তরুণ মুখোপাধ্যায়	আধুনিক বাংলা কবিতার বিবর্তন
২০১২	বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য	উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা কবিতা
২০১৩	সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়	বিশ শতকের চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা : প্রতিবাদের দলিল
২০১৪	বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	আধুনিক বাংলা কবিতায় উপমা, রূপকল্প ও চিত্রকল্প
২০১৫	সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়	স্বামী চণ্ডিকানন্দ ও তাঁর সংগীত সাধনা
২০১৬	সুমিতা চক্রবর্তী	বাংলা গদ্যের বিবর্তন : সার্ধশতবর্ষ
২০১৭	তরুণ মুখোপাধ্যায়	বাংলা গদ্যকবিতার রূপ-রূপান্তর

এবার সহ গত কয়েক বছর রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ উন্মোচনকারী গুণীগণ :

সাল	উন্মোচক
২০১১	বিশিষ্ট অসমিয়া কবি হীরেন ভট্টাচার্য
২০১২	বিশিষ্ট অসমিয়া কবি ও সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২০১৩	বিশিষ্ট অসমিয়া কবি ও সমালোচক ভবেন বরুয়া
২০১৪	বিশিষ্ট অসমিয়া বুদ্ধিজীবী ও 'দৈনিক জনসাধারণ' পত্রিকার (তৎকালীন) সম্পাদক শিবনাথ বর্মন
২০১৫	অসমিয়া কবি তথা শিশুসাহিত্যের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীমতী তোষপ্রভা কলিতা
২০১৬	অসমিয়া ও বাংলা ভাষার সুপরিচিত লেখক শ্রীমতী অণিমা গুহ
২০১৭	সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট অসমিয়া সাহিত্যিক শ্রীমতী নিরুপমা বরগোহাঞি
২০১৮	বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী মুক্তি চৌধুরী
২০১৯	বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবিকা শ্রীমতী নন্দিতা ভট্টাচার্য গোস্বামী
২০২০	বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাব্রতী পান্নালাল গোস্বামী
২০২২	বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ উষারঞ্জন ভট্টাচার্য
২০২৩	বিশিষ্ট কবি শঙ্খশুভ্র দেববর্মন
২০২৪	বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ উষারঞ্জন ভট্টাচার্য

২০১০ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

অজিৎ বরুয়া

গত শতকের চল্লিশের দশকে আধুনিক অসমিয়া কবিতার জগতে মুষ্টিমেয় যে-কয়েকজন সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন অজিৎ বরুয়া তাঁদের অন্যতম।

প্রয়াত চিত্রমল্ল ও পদ্মলতা বরুয়ার পুত্র অজিৎ-এর জন্ম গুয়াহাটিতে, ১৯২৬ সালের ১৯ আগস্ট। কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে অসমে তৃতীয় স্থান লাভ করে ১৯৪৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪৭ সালে কটন কলেজ থেকেই ইংরেজি অনার্স-সহ স্নাতক এবং ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

অসমিয়া কবিতায় আধুনিকতার বার্তা বহনকারী অজিৎ বরুয়ার প্রথম পর্যায়ের কবিতার মধ্যে রয়েছে 'তীখা', 'হাতুরী', 'মন-কুঁঅলী সময়', 'দুখর কবিতা', 'কিছুমান ব্রোঞ্জর ঢেকীয়া', 'এযোর তামর অর্ঘা', 'চেনর পারত' ইত্যাদি; অতঃপর 'জেংরাই ১৯৬৩' সহ 'ব্রহ্মপুত্র', 'শব্দ-সংবেদ্য', 'স্বর্ণচম্পা' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যসম্ভার। চল্লিশের দশক থেকে সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত কবিতার সঙ্গে তাঁর যে-দীর্ঘকালব্যাপী একাত্মতা, আধুনিক কবিতার প্রবক্তা টি. এস. এলিয়টের জীবন ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ অধ্যয়ন ও চর্চা, তৎসহ ইংরেজি ও ফরাসি কবিতার তাত্ত্বিক ও নান্দনিক দিকের সঙ্গেও সুপরিচিত হওয়ার মানসে কাব্যতত্ত্বের যে-নিরলস সাধনা তিনি করেছেন— সে-সবের জন্যই তাঁর কবি-পরিচিতি অন্যান্য পরিচয়কে ছাপিয়ে গেছে।

ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার (আই.এ.এস) একজন নিষ্ঠাবান অফিসার হিসাবে অসম সরকারের বিভিন্ন পদে কর্মজীবন অতিবাহিত করে নামনি অসমের কমিশনার হিসাবে চাকরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮৬ সালে। তখন পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ছিল মাত্র একটি ('কিছুমান পদ্য আরু গান', ১৯৮২)। পরবর্তী দুই দশকে, ১৯৮৩-২০০২ সময়কালে গান-কবিতা-অনুবাদ ছাড়াও তিনি সাহিত্য-সমালোচনা ও প্রবন্ধের কুড়িটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, একটি উপন্যাস লিখেছেন, সেইসঙ্গে উপহার দিয়েছেন পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ। অসমিয়া ও ইংরেজি ছাড়াও বাংলা, ফরাসি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেছেন নিষ্ঠাভরে। তাঁর প্রকাশিত বাংলা কাব্যগ্রন্থের নাম 'ব্রহ্মপুত্র, স্কিৎজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি' এবং তিনিই গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত বাংলা দৈনিক 'সময় প্রবাহ'-র প্রথম সংখ্যায় (১ জানুআরি ১৯৯০) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' শীর্ষক উত্তর-সম্পাদকীয় নিবন্ধটি লিখেছিলেন। এ-যাবৎ যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীবরুয়া তার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার (১৯৮৮), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), অসম সাহিত্য সভার পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৯) এবং অসম সরকার প্রদত্ত কবি গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)।

২০১৫ সালের ৩ এপ্রিল তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

২০১০ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য গত চার দশক ধরেই একটি উজ্জ্বল নাম।

তাঁর জন্ম ১৯৩৯ সালের ৩ অক্টোবর অসমের করিমগঞ্জ জেলার কায়স্থগ্রামে। ঈশানচন্দ্র ও সুকুন্তলা ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ সন্তান বিজিৎ-এর পড়াশোনা নিলামবাজারে বিপিনচন্দ্র হাইস্কুল, শিলঙে সেন্ট এডমান্ড্স কলেজ এবং গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৬ সালে হাইলাকান্দির এস এস কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কর্মজীবন শুরু। ওই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন ২০০২ সালে।

সাহিত্যের প্রতি বিজিৎ-এর অনুরাগ কৈশোরকাল থেকেই। বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময়েই 'তরুণ' নামের এক সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেন (১৯৫৪-৫৬), শিলঙে ছাত্রাবস্থায় সম্পাদনা করেন 'মুরজ', 'মৌসুমীরাগ' (১৯৬১-৬৩)। কর্মজীবনে প্রবেশের পরে তাঁর সম্পাদনায় হাইলাকান্দি থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশ পায় ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য'। পত্রিকাটি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অস্তিত্ব বজায় রেখে এই অঞ্চলের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি সহ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'দৃশ্যে নায়িকার অনুপস্থিতিতে' সেখানে মঞ্চস্থ হয়ে শ্রেষ্ঠ নাটকের পুরস্কার লাভ করে ১৯৬৫ সালে।

বিজিৎ-এর প্রকাশিত কাব্যসংকলনের সংখ্যা আট— ১৯৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কেউ পরবাসী নয়', এরপর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায় 'জেগে আছে স্তব্ধতায়', 'সুন্দর যেখানে খেলা করে', 'মহাভারত কথা', 'পুনর্ভবা', 'ও ছেলে বাউল ছেলে', 'ভালো আছি সকলের সঙ্গে ভালো আছি' এবং 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। তাঁর সম্পাদিত 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' (১৯৬৯) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিদের এক মলাটের মধ্যে স্থান দেওয়ার প্রথম প্রচেষ্টা; শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে সম্পাদনায় সংকলনটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। অন্যান্য যেসব গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদি নিয়ে ছয় খণ্ডের 'নির্বাচিত সাহিত্য'; 'অতন্দ্র এবং বরাক উপত্যকার বাংলা কাব্যচর্চা', 'শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং বরাক উপত্যকার সঙ্গীতচর্চা' এবং 'বরাক উপত্যকায় চারুকলাচর্চা'। তাঁর রচিত প্রবন্ধের বইগুলির নাম যথাক্রমে 'সুরক্ষিত বন্দিশালা', 'বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন', দুই খণ্ডে 'উত্তর পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্যের সাতকাহন' এবং '১৯শে মে এবং আসামে বাঙালির অস্তিত্বের সংকট'। শ্রীভট্টাচার্যের স্মৃতিমূলক সুপাঠ্য রচনা 'বিকেলের আলো' প্রসাদগুণে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর আরো একটি স্মৃতিকথা 'দিনান্তের বৈঠক' এবং উপন্যাস 'পটভূমি' শিলচরের দুটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বিজিৎ বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন, যার মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন পুরস্কার ১৯৯২', একই বছরে সেরা সম্পাদক হিসাবে 'অনির্বাণ' পুরস্কার, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃক 'জীবনানন্দ শতবার্ষিকী পুরস্কার' (১৯৯৯) এবং 'রামকুমার নন্দী মজুমদার স্মৃতি পদক' (২০০২), গুয়াহাটিতে 'একা এবং কয়েকজন' পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রদত্ত 'সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মান ও স্মারক' (২০০২) এবং কলকাতায় 'সাহিত্য-সেতু' পুরস্কার (২০০৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়াও গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রয়াণ : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে।

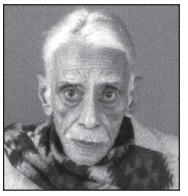

২০১১ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

হীরেন ভট্টাচার্য

তিনি ছবি আঁকেন, গান লেখেন। তাঁর কবিতায়ও তাই অনায়াস চিত্রধর্মিতা, অন্তর্লীন সুরের প্রবাহ, যা নিছক গীতিময়তা নয়।

বর্তমানে সৃষ্টিশীল অসমিয়া কবিদের মধ্যে হীরেন ভট্টাচার্য প্রবীণতম হয়েও সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাঁর চেহারায় যেমন কোনো বিশেষত্ব খোঁজার চেষ্টা বৃথা তেমনই মানুষটিও খুবই সাদাসিধে। পোশাকে পারিপাট্যের বালাই নেই, যেমন-তেমন একটা ট্রাউজার ও হাফশার্ট হলেই তাঁর চলে যায়, কখনো-কখনো কাঁধে থাকে একটা ঝোলা, শীতকালে সোয়েটারের সঙ্গে মাফলার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে ভালোবাসেন, কিন্তু বক্তৃতা দিতে হলে দু-চার মিনিটের বেশি ব্যয় করেন না। তিনি কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-শিল্পী সহ সাধারণ মানুষের এতটাই আপনজন যে 'হিরুদা' নামেই সকলের কাছে পরিচিত।

প্রয়াত তীর্থনাথ ও স্নেহলতা ভট্টাচার্যের পুত্র হীরেনের জন্ম উজান অসমের যোরহাটে, ১৯৩২ সালের ২৮ জুলাই। ছোটবেলা কেটেছে যোরহাট ছাড়াও ডিব্রুগড়, গোলাঘাট ও তেজপুরে। গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৪৯ সালে। কলেজ-জীবন সুশৃঙ্খল ছিল না, শেষে গুয়াহাটিরই বি. বরুয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় ইতি।

পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গুয়াহাটি শাখায় যোগদান এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-কর্মী। কিছুদিন এক গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা, পরে বিভিন্ন প্রেসে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছেন। ছিলেন আকাশবাণীর গুয়াহাটি কেন্দ্রের নিয়মিত গীতিকার। সাম্যবাদী কবি হীরেনের রচনায় প্রকৃতি ও মানব-প্রেমের আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ করা যায়, যেখানে মিশে থাকে মাটির গন্ধ এবং সেইসঙ্গে রোমান্টিকতাও।

তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'মোর দেশ মোর প্রেমর কবিতা' প্রকাশ পায় ১৯৭২ সালে, যদিও লেখালিখির শুরু পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে। অসমিয়ার মতোই বাংলা ভাষায়ও তিনি সমান দক্ষ। চারটি বাংলা কাব্য-সংকলন সহ তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা আঠারো, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কবিতার র'দ' (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা' (১৯৮১), 'শইচর পথার মানুহ' (১৯৯১), 'জোনাকি মন ও অন্যান্য' (বাংলা, ১৯৯১), 'মোর প্রিয় বর্ণমালা' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার বোকামাটি' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার দিকচৌ বাটেরে' (২০০০), 'সিপার পরা পাতালৈকে' (২০০৯), 'বৃষ্টি পড়ে অঝোরে' (বাংলা, ২০১১) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীভট্টাচার্য তার মধ্যে রয়েছে 'বিভিন্ন দিনর কবিতা'র জন্য অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত রঘুনাথ চৌধারী পুরস্কার (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা'র জন্য ১৯৮৫ সালে অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত বিষ্ণু রাভা পুরস্কার, একই বছরে একই গ্রন্থের জন্য ভারতীয় বিদ্যা ভবন প্রদত্ত রাজাজি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে ওই বইয়ের জন্যই সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার, 'শইচর পথার মানুহ'-এর জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), উক্ত গ্রন্থের জন্য ভারতীয় ভাষা পরিষদ প্রদত্ত বাজালিনী পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (২০০০) এবং অসম সরকার প্রদত্ত গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)। এ-ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ হিন্দি সংস্থান-এর পক্ষ থেকে পেয়েছেন সৌহার্দ্য সম্মান।

পদ্মনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি গ্রহণের প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে ৪ জুলাই (২০১২) তাঁর দেহাবসান ঘটে।

২০১১ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা 'সিগনেট' থেকে 'দর্পণে অনেক মুখ' বেরনোর পরই অনেককে চমকে দিয়েছিলেন, স্থান করে নিয়েছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে। পরের বছরই, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় 'শবযাত্রা'— যা নিছক দীর্ঘকবিতা নয়, 'মহাকবিতা' আখ্যায় ভূষিত হয়ে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে, যেখানে আজও তিনি অনন্য।

রোহিণীকান্ত ও যোগমায়া মুখোপাধ্যায়ের পুত্র পবিত্রের জন্ম পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) বরিশাল জেলায়, ১৯৪০ সালের ১২ ডিসেম্বর। বাল্যেই মাতৃবিয়োগ এবং মাসির স্নেহে বড় হয়ে ওঠা, তারপর দেশভাগের বলি হয়ে কলকাতায় ছিন্নমূল ও সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত। কৈশোর থেকেই শুরু হয় চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই। ছিল না কোনো স্থায়ী আস্তানাও। পড়াশোনা চালাতে হয় টিউশনি করে। কলেজে পড়ার সময়েই কাজ জোটে ভবানীপুরের সাউথ সাবার্বান স্কুলে— প্রথমে লাইব্রেরিতে, পরে শিক্ষকতা। এম.এ. পাশ করার পর বিদ্যানগর কলেজে অধ্যাপনা।

ছাত্রাবস্থাতেই প্রকাশ করেন ব্যতিক্রমী লিট্‌ল ম্যাগাজিন 'কবিপত্র', এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অর্ধশতক অতিক্রম করেছেন। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে নিজেকে পালটেছেন, পরিবর্তিত হয়েছে রচনাভঙ্গি এবং তাঁর কলমে জন্ম নিয়েছে 'শবযাত্রা' ('ভাসান'-এ যার পরিসমাপ্তি) ছাড়াও আরও কয়েকটি মহাকবিতা— 'ইবলিসের আত্মদর্শন' (১৯৬৯, যেটি পরে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'Iblish Confronts Himself' শিরোনামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন লীলা রায়), 'বিযুক্তির স্বেদরক্ত' (১৯৭২), 'অলর্কের উপাখ্যান' (১৯৮২), 'পরশুরাম পর্ব' (১৯৯৪), 'জতুগৃহে আছি' (২০০৯)। সনেট রচনায়ও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ।

আশির দশকে কবিতা নিয়ে শুরু করেন নতুন আন্দোলন— 'থার্ড লিটারেচার আন্দোলন', এল 'প্রয়োগবাদী কবিতা'। পবিত্রের নিজের কথায়— "পাঠকের সঙ্গে কবির সম্পর্ক হবে সহমর্মীর, দূরত্বের নয়।... আমাদের কবিতা পড়ে যে-কেউ মনে করতে পারেন, এ-লেখাটা তাঁরই লেখার কথা, কীভাবে যেন অন্য কেউ লিখে ফেলেছে।" এভাবেই তিনি সমসাময়িক কবিদের চেয়ে হয়ে পড়েন স্বভাবত স্বতন্ত্র।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'হেমন্তের সনেট' (১৯৬১), 'আগুনের বাসিন্দা (১৯৬৭), 'দ্রোহহীন আমার দিনগুলি' (১৯৮২), 'ভারবাহীদের গান' (১৯৮৩), 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি' (১৯৮৫), 'আছি প্রেমে, বিষাদে, বিপ্লবে' (১৯৮৭), 'আরোগ্যভূমির দিকে' (১৯৯৪), 'বিষ নয়, উঠেছে অমৃত' (১৯৯৯), 'সন্ধিক্ষণে আছি' (২০০১), 'শোনো স্বপ্নভুক, শোনো' (২০০৫), 'আমি ভূতগ্রস্ত কবি' (২০০৭), 'আগুনে সন্ন্যাসে আছি' (২০০৮), 'চেনা পথ অন্ধকার' (২০১০), 'সচেতন স্বপ্নচারী' (২০১১) প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ : 'বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন' (১৯৭৪), 'কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৮১), 'সূর্যকরোজ্জ্বল জীবনানন্দ' (১৯৯৯), 'সত্তার সাম্রাজ্য ও কবিতা' (২০০০), 'কবির দেশ, কবিতার দেশ' (২০০৯), আত্মজীবনীমূলক 'দ্রোহীপুরুষ' (২০০৯) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন পবিত্র তার মধ্যে রয়েছে জীবনানন্দ পুরস্কার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পুরস্কার, শিলীন্ধ্র পুরস্কার, পদ্মাগঙ্গা পুরস্কার, ভারতচন্দ্র পুরস্কার, বিষ্ণু দে পুরস্কার, প্রেমেন্দ্র মিত্র পুরস্কার, তারাশঙ্কর-বিভূতি পুরস্কার, চোখ পুরস্কার, আমি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, 'কবিপত্র' সম্পাদনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক সম্মান প্রদান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী সম্মাননা।

তিনি ২০২১ সালের ৯ এপ্রিল প্রয়াত।

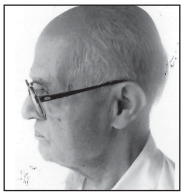

২০১২ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী নীলমণি ফুকন

অনেকের কাছে অসমের 'জীবনানন্দ দাশ' হিসেবে তাঁর পরিচয়, তবে তিনি-যে অসমিয়া কবিতায় এক স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা সে-কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। একই সঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন একজন বিদগ্ধ শিল্প-সমালোচক রূপেও।

কীর্তিনাথ ফুকন ও বরদাবালা দেবীর পুত্র নীলমণির জন্ম উজান অসমের দেরগাঁও-এ, ১৯৩৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। সেখানেই কেটেছে শৈশব ও কৈশোর। দেরগাঁও হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ভরতি হন গুয়াহাটির কটন কলেজে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে গুয়াহাটির আর্য বিদ্যাপীঠ কলেজে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে যোগদান, সেখান থেকেই অবসরগ্রহণ ১৯৯২ সালে।

নীলমণি শুধুই সমাজ-সচেতন কবি নন, দেশ ও রাজ্যের সমকালীন যাবতীয় বিষয় তাঁকে ভাবায়, ব্যক্তিগত অনুভূতিতে জারিত হয়ে উঠে আসে তাঁর কবিতায়। তাঁর অনায়াস বৈদগ্ধ্যের পিছনে রয়েছে বিশ্বসাহিত্যের অনলস অধ্যয়ন। তিনি যেমন খুবই কম লেখেন, তেমনই কবি হিসাবেও তাঁর আত্মপ্রকাশ কিছুটা বিলম্বে। নীলমণির প্রথম কবিতা-সংকলন 'সূর্য হেনো নামি আহে এইনদীয়েদি' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে, রঙিয়ার 'প্রকাশন ঘর' থেকে। দু-বছর পরে তাঁর দ্বিতীয় কবিতা-সংকলন 'নির্জনতার শব্দ' প্রকাশ পায় গুয়াহাটির বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা 'দত্ত বরুয়া' থেকে। এই পুরস্কার প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত আটটি কাব্যগ্রন্থের জনক, যার মধ্যে রয়েছে 'আরু কি নৈঃশব্দ্য' (১৯৬৮), 'ফুলি থকা সূর্যমুখী ফুলটোর ফালে' (১৯৭২), 'কাঁইট, গোলাপ আরু কাঁইট' (১৯৭৫), 'কবিতা' (১৯৮১), 'নৃত্যরতা পৃথিবী' (১৯৮৫) এবং 'অলপ আগতে আমি কি কথা পাতি আছিলো' (২০০৩)।

তাঁর নির্বাচিত কবিতা-সংকলনের সংখ্যা তিন : 'গোলাপী জামুর লগ্ন' (বাণী প্রকাশ, গুয়াহাটি, ১৯৭৭), 'সাগরতলীর শঙ্খ' (ড. হীরেন গোহাঁই সম্পাদিত, লয়ার্স বুক স্টল, গুয়াহাটি, ১৯৯৪) এবং 'নীলমণি ফুকন : সম্পূর্ণ কবিতা' (অর্থাৎ, গুয়াহাটি, ২০০৬)। নীলমণির বাংলায় অনূদিত কাব্যগ্রন্থও তিনটি : 'নির্বাচিত কবিতা : নীলমণি ফুকন' (অনুবাদক তড়িৎ চৌধুরী, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪), 'পড়োশি গোলাপ : নীলমণি ফুকনের কবিতা' (অনুবাদক রমানাথ ভট্টাচার্য, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৭) এবং 'নীলমণি ফুকনের কবিতা' (অনুবাদক রবীন্দ্র সরকার, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৭)। তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'সিলেক্টেড পোয়েম্‌স : নীলমণি ফুকন' (অনুবাদক কৃষ্ণদুলাল বরুয়া, সাহিত্য অকাদেমি, নয়া দিল্লি, ২০০৭), তা ছাড়া 'বিচিত্র লেখা', যা কয়েকটি নির্বাচিত গদ্য ও অনূদিত কবিতার সংকলন (বনফুল, ২ ০১০)। অসমিয়া ভাষায় লেখা তাঁর শিল্প ও শিল্পী বিষয়ক বইগুলি হল 'লোক কল্পদৃষ্টি' (১৯৮৭), 'রূপ বর্ণ বাক্' (১৯৮৮), 'শিল্পকলা দর্শন' (১৯৯৮) এবং 'শিল্পকলার উপলব্ধি আরু আনন্দ' (অন্বেষা, ২০১২)। তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থটির নাম 'পাতি সোনারুৱা ফুল' (২০০৬)।

কবি হিসাবে ১৯৮২ সালে নীলমণি ম্যাসিডোনিয়ায় 'স্ট্রুগা পোয়েট্রি ইভনিং'-এ অংশগ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : অসম সাহিত্য সভার 'রঘুনাথ চৌধারী পুরস্কার' (১৯৭২), কবিতার জন্য অসম প্রকাশন পরিষদ পুরস্কার (১৯৭৭), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৮১), 'লোক কল্পদৃষ্টি' গ্রন্থের জন্য জগদ্ধাত্রী হরমোহন পুরস্কার (১৯৮৮), অসম সাহিত্য সভার 'ছগনলাল জৈন পুরস্কার' (১৯৯১), কমলকুমারী ফাউন্ডেশন প্রদত্ত 'কমলকুমারী জাতীয় পুরস্কার' (১৯৯৪), উইলিয়ামসন মেগর প্রদত্ত 'অসম উপত্যকা পুরস্কার' (১৯৯৮), ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার (কলকাতা, ২০০০), জোশুয়া ফাউন্ডেশনের 'জোশুয়া সাহিত্য পুরস্কারম' (হায়দরাবাদ, ২০০১), গঙ্গাধর মেহের জাতীয় পুরস্কার (সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ওড়িশা, ২০০২)। এ-ছাড়া পদ্মশ্রী খেতাব পেয়েছেন (১৯৯০), নয়াদিল্লির মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সম্মানিত সদস্য ছিলেন (১৯৯৯-২০০১) এবং ছিলেন সাহিত্য অকাদেমির 'ফেলো'।

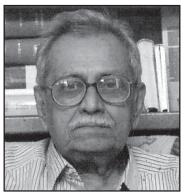

২০১২ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

তরুণ সান্যাল

তরুণ সান্যাল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহ বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত থাকলেও কবি হিসাবেই তাঁর সমধিক পরিচিতি। তাঁর কবিজীবন আক্ষরিক অর্থেই স্বাধীনতার সমবয়সি। কিশোরদের পত্রিকা 'রামধনু'-তে তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৪৭ সালে, মাত্র পনেরো বছর বয়সে। এবং এই পুরস্কার প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত তাঁর সৃজনশীলতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

আইনজীবী পিতা অশ্বিনীকুমার সান্যাল ও হিরণময়ী দেবীর পুত্র তরুণের জন্ম পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলায় শাহাজাদপুর পরগনার পোরজনায় (বর্তমান বাংলাদেশ) ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর (১২ কার্তিক, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। শৈশব, বাল্য ও কৈশোর কেটেছে পোরজনা ছাড়াও বাঁকুড়া, রাজশাহি ও বর্ধমান জেলা এবং কলকাতায়। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে ১৯৫৭ সালে কয়েক মাস উত্তরবঙ্গে বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপনার পর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে যোগ দেন। সেখানেই ১৯৫৮ থেকে ১৯৯৪ সালে সহাধ্যক্ষ হিসাবে অবসরগ্রহণ পর্যন্ত কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তরুণ সান্যাল সাহিত্য-সংস্কৃতি ছাড়াও একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণের সুবাদে মাত্র দশ বছর বয়সেই বাঁকুড়ার এক মিছিলে যোগ দিয়ে কাঁদানে গ্যাসে আহত হন। শেষ-কৈশোরেই (১৯৪৯-৫০) নিবর্তনমূলক আইনে গ্রেপ্তার হয়ে বর্ধমান জেলা কারাগারে অন্তরিন হন, পরেও একাধিক বার রাজবন্দি হয়েছেন। সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন ১৯৫৯ সালের খাদ্য-আন্দোলনেও। কমিউনিজ্‌মে বিশ্বাসী তরুণ ১৯৬৭-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট-এর পক্ষে যেমন প্রচারে নেমেছেন, তেমনই যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামেও, ওই অস্থির দিনগুলোতে সেখানকার বহু বুদ্ধিজীবীকে আশ্রয়দান ও জীবনযাপনে সহায়তা করেছেন। ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থার আহ্বায়ক এবং ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সম্পাদক (১৯৭২-৮১)। ১৯৮১ সালে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, নাট্য ও চলচ্চিত্র সহ বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তরুণ সান্যালের প্রথম কবিতা-সংকলন 'মাটির বেহালা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ছিল চব্বিশ। শেষদিকের দুটি কাব্যগ্রন্থ 'বাউকুড়ানির ব্রহ্মডাঙা' (২০০৯) এবং 'হাত ভরা ফুলের গল্প' (২০১০)। 'সর্বেশ্বরী শব্দেশ্বরী', 'মরিয়মের মীরা', 'অচিন পাখির একা', 'সন্ত্রাসে সংলাপে' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য-সংকলন। তা ছাড়া রয়েছে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (দে'জ, কলকাতা), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (ঢাকা), 'কবিতা সংগ্রহ' দুই খণ্ড (দে'জ) এবং 'কবিতা সমগ্র' তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড (দিয়া প্রকাশন)। তিনি মোট ৪২টি কাব্যনাটক রচনা করেছেন, তার মধ্যে ৩৫টি গ্রন্থভুক্ত। তাঁর অনূদিত কবিতার বই তিনটি এবং চারটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা আট। যে-সব পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে তরুণ যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের মুখপত্র 'একতা' (১৯৫৫), 'কবিপত্র' (যুগ্মভাবে, ১৯৫৮), 'সীমান্ত' (১৯৬২-৬৭), 'পরিচয়' (যুগ্মভাবে, ১৯৬৭-৭৫), 'রুশ-ভারতী' (১৯৭২-৮১), এ-ছাড়া ২০০২ সাল থেকে সাপ্তাহিক 'সপ্তাহ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন।

বাংলাভাষায় গত শতকের পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট কবি হিসাবে চিহ্নিত তরুণ সান্যাল তাঁর বর্ণময় দীর্ঘ জীবনে বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে উল্টোরথ পুরস্কার (১৯৭১), বিষ্ণু দে স্মারক সম্মান, রামমোহন সম্মান, বঙ্গবন্ধু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সহ আরও প্রায় ২০টি সম্মান, ভারতভাষা ভূষণ সম্মান (১৯৯৫), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' (২০০৬), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সম্মান (২০১২) বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

২০১৭ সালের ২৮ আগস্ট তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

২০১৩ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অসমিয়া কাব্যভুবনে নীলমণি ফুকনকে যদি বলা হয় অসমের 'জীবনানন্দ দাশ' তাহলে অসমের 'বুদ্ধদেব বসু' হিসেবে নিশ্চয় পরিচিত হওয়া উচিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হীরেন্দ্রনাথ সারাজীবন শিক্ষকতা করেছেন ঠিক বুদ্ধদেব বসুর মতোই। পাশাপাশি লিখেছেন কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা ও নিখাদ গদ্য। বস্তুত কাব্যজগতে এই কবি বেশ দেরিতে প্রবেশ করেছেন বলা যায়। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সোমধিরির সোঁৱরণি আরু অন্যান্য কবিতা'। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি যে-নিজস্বতার স্বাক্ষর রাখেন তা পরবর্তী কালেও অম্লান রয়েছে।

১৯৩৭ সালের পয়লা মার্চ যোরহাট জেলার তিতাবরে জন্ম হীরেন্দ্রনাথের। পড়াশোনা তিতাবর স্কুল থেকে গুয়াহাটির কটন কলেজ (ইংরেজিতে অনার্স) হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রসারিত। ১৯৫৯ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার লেকচারার হিসেবে যোগ দেন, ১৯৮২-তে রিডার পদে উন্নীত হন এবং ২০০০ সালে কর্মজীবনের ইতি টানেন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থেকেই।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যগ্রন্থ তিনটি— 'সোমধিরির সোঁৱরণি আরু অন্যান্য কবিতা' (১৯৮১), 'মানুহ অনুকূলে' (২০০০) ও 'পল অনুপলর আঁচ' (২০০৭)। পাশাপাশি লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ ও আলোচনা। তাঁর আলোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলন 'কিতাপর ভবিষ্যৎ' প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। তাঁর প্রবন্ধের আরেকটি বই 'নির্বাচিত সমালোচনা'। ইংরেজি ভাষায় সম্পাদনা করেছেন প্রদীপ আচার্য অনূদিত 'ওআন হানড্রেড ইয়ার্স অব অ্যাসামিজ পোয়েট্রি'। অসম সরকারের প্রকাশনা পর্ষৎ প্রকাশিত এই গ্রন্থের বিশেষত্ব হীরেন্দ্রনাথ-লিখিত সুদীর্ঘ ভূমিকা।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মানুহ অনুকূলে'র জন্য ২০০৪ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি অসমিয়া কবিতায় নিয়ে এসেছেন মেধা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের এক বিশেষ ঝলক। কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে শুধুই সংখ্যা দিয়ে নিজেকে সমকালীন রাখা নয়, হীরেন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন অনেকটা নির্জনে, একাকী। কম লিখেছেন, কিন্তু যা লিখেছেন সবই হয়ে উঠেছে মন্ত্র। তাঁর ভাষা চিত্রধর্মী, কবিতায় অনেক সময় তিনি গ্রামীণ শব্দ ব্যবহার করেন। প্রকৃতির কোল থেকে উঠে আসে তাঁর চিত্রকল্প, লোকগীতি বা রূপকথা থেকে উঠে আসে তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি। সেইসঙ্গে রয়েছে সংগীতময়তার অভিব্যক্তি। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, বিষাদ-যন্ত্রণা তাঁর কবিতার প্রিয় বিষয়।

১৯৮৭ সালে হীরেন্দ্রনাথ ভূপালের ভারত ভবনে যোগ দেন 'কবি ভারতী কবিসম্মেলন'-এ। দু-বছর পর 'অসম সাহিত্য সভা'-র ডুমডুমা অধিবেশনের কবিসম্মেলনের তিনিই ছিলেন নির্বাচিত সভাপতি। অসমের বিখ্যাত সাময়িকপত্র 'গরীয়সী' ও 'প্রকাশ'-এ তাঁর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শুধু অসমিয়া নয়, তাঁর শাণিত মেধা ঝরে পড়েছে ইংরেজিতেও। সাহিত্য অকাদেমির গুয়াহাটি, কলকাতা, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন কবিসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ।

২০১৬ সালের ২০ ফেব্রুআরি তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

২০১৩ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

স্বপন সেনগুপ্ত

ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল আকাশ : পাখি' যখন প্রকাশিত হয় তখন ত্রিপুরার কবি স্বপন সেনগুপ্তের বয়স মাত্র একুশ বছর। কবিরা সাধারণত হাত পাকান লিট্‌ল ম্যাগাজিনে, অথচ এই কবি লিট্‌ল ম্যাগাজিনে লেখার আগেই নিজস্ব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে ফেলেছেন। আর যখন তিনি লিট্‌ল ম্যাগাজিন 'নান্দীমুখ' বের করলেন, অচিরেই সেটি হয়ে উঠল শুধু ত্রিপুরা বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট পত্রিকা।

কবি স্বপন সেনগুপ্তের জন্ম ১৯৪৫ সালের ২ ডিসেম্বর। আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে সাহিত্য বিষয়ে লেখাপড়া। শেষপর্যন্ত সাহিত্য বিষয়েই পিএইচডি। ছাত্রজীবনেই কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি সম্পাদনা করেন নিজ কলেজের মুখপত্র 'প্রাচী'। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের দু-বছর পর তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নান্দীমুখ'। বাংলা ভাষার বহু উল্লেখযোগ্য কবি এই পত্রিকায় লিখেছেন। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ('এ আমার ভিখিরি হাত নয়') প্রকাশিত হয় দীর্ঘদিন পরে, ১৯৮৫ সালে। সে-বছরই আরেকটি কাব্যগ্রন্থ 'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া'। এমন নয় যে এই কবি শুধু নিজের কাব্যভুবনেই আত্মমগ্ন। বরং তিনি খুব বেশি করে জড়িয়ে পড়েছেন ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা লেখালিখির জগতের সঙ্গে। ১৯৭৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'দ্বাদশ অশ্বারোহী', যেখানে রয়েছে ত্রিপুরার ১২ জন বিশিষ্ট কবির কবিতা। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার কবিদের কবিতা নিয়ে ১৯৮৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'গঙ্গা গোমতী'। একই সময়ে স্বপন সেনগুপ্ত কিন্তু নিজস্ব পত্রিকা 'নান্দীমুখ'ও সম্পাদনা করে চলেছেন। ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আরও দুটি গ্রন্থ—যথাক্রমে 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' ও 'অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতা ও কাব্যালোচনা'।

বর্তমান শতকে প্রকাশিত স্বপনের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ হল 'ধুলোমাখা পিঁড়িতে একাকী', 'যুগলবন্দি তুফান', 'দহন ও জলস্তর', 'কবিতা সমগ্র-১' ও 'হারানো ঢেউয়ের জলপাই শিস'। তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা কবিতা' প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। এ-ছাড়া রয়েছে গদ্যগ্রন্থ 'স্বনির্বাচিত লেখালেখি' (২০০৬)।

স্বপন সেনগুপ্ত 'নান্দীমুখ' সম্পাদনা করেছেন ২৭ বছর। সম্পাদনা করেছেন ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পাক্ষিক পত্রিকা 'গোমতী'ও। কবি হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করলেও স্বপন সেনগুপ্তের গদ্যের হাতটি যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। বিভিন্ন সাময়িকী ও লিট্‌ল ম্যাগাজিনে কবিতা-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। 'বিশ্ববাংলা কবিতা সংকলন' ও 'পেঙ্গুইন বুকস্'-এর Dancing Earth কাব্য সংকলনে তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে।

যেসব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন স্বপন তার মধ্যে রয়েছে সারা বাংলা কবি সম্মেলন থেকে সংবর্ধনা (১৯৭২), ত্রিপুরা সরকারের কবি সুকান্ত স্মৃতি পুরস্কার (২০০৬), রবীন্দ্র পরিষদ থেকে বিজনকৃষ্ণ সাহিত্য পুরস্কার (২০০৭), ত্রিপুরা সরকারের কবি সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন স্মৃতি পুরস্কার (২০১১) এবং ঢাকায় জাতীয় কবিতা পরিষদের বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রণ (২০১৩)।

তিনি ২০১৯ সালের ১৯ মে (রবিবার) প্রয়াত।

২০১৪ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী ভবেন বরুয়া

শিক্ষাবিদ তথা সাহিত্যিক ভবেন বরুয়ার জন্ম উজান অসমের শিবসাগর জেলায় যোরহাট মহকুমার অন্তর্গত জানজিতে, ১৯৩৯ সালের ১৬ ফেব্রুআরি। দেবেন্দ্রনাথ ও কাঞ্চনবালা বরুয়ার সন্তান ভবেনের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় গ্রামের স্কুলে, তবে ম্যাট্রিক পাশ করেন গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে, ১৯৫৬ সালে। যোরহাটের জগন্নাথ বরুয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর তিনি ইংরেজি অনার্স নিয়ে স্নাতক হন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েটে স্কলারশিপ পান ভবেন। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় ভবেন বরুয়া অতিবাহিত করেছেন শিক্ষকতায়। যোরহাটে স্কুলের শিক্ষক হিসেবে যে-কর্মজীবন শুরু হয়েছিল তার শেষ হয় গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে। মাঝখানে তিনি পাতিয়ালার পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ও সিমলায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডি-তেও কাজ করেছেন, ছয়ের দশকে তিনবছর ছিলেন আকাশবাণী, দিল্লির অসমিয়া সংবাদপাঠক।

ইংরেজির শিক্ষকতা করলেও ভবেন বরুয়ার অসমিয়া ভাষায় ছন্দের হাত চমৎকার। 'সোনালী জাহাজ' কাব্যগ্রন্থের জন্য লাভ করেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। এই গ্রন্থটিই তাঁকে এনে দেয় আসাম পাবলিকেশন বোর্ড সাহিত্য সম্মান। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'নতুন পৃথিবী' (বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠকালে প্রকাশিত), 'সোনালী জাহাজ', 'পোন্ধরটা কবিতা', 'বগা জুই কলা জুই আরু অন্যান্য কবিতা', 'অসমিয়া কবিতা : রূপান্তরর পর্ব', 'অসমিয়া কবিতা : বিবর্তনর পর্ব', 'প্রসঙ্গ : কবিতা', 'প্রসঙ্গ : বাণীকান্ত', 'প্রসঙ্গ : জ্যোতিপ্রসাদ', 'প্রসঙ্গ : ভবেন্দ্রনাথ', 'অসমর বৌদ্ধিক দুরবস্থার প্রসঙ্গত', 'ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন ইন নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া', 'সায়েন্স, পোয়েট্রি অ্যান্ড পলিটিক্স'।

শিক্ষকতা ও সাহিত্য রচনার পাশাপাশি ভবেন বরুয়া বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে 'সংলাপ' (অসমিয়া), 'আসাম কোয়ার্টারলি' (ইংরেজি), 'জার্নাল অব দ্য ইউনিভার্সিটি অব গৌহাটি : আর্টস' (ইংরেজি), 'সুদর্শন' (ইংরেজি), 'নতুন পর্যায়র সংলাপ' (অসমিয়া)।

অসম তথা ভারতে ভবেন বরুয়া বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও গবেষক হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন সম্মেলন ও সভায় তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এস. সি. দেব শতবার্ষিকী বক্তৃতা, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সেইন্ট শংকরদেব, ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন অ্যান্ড দ্য ফিলসফি অব বৈষ্ণবিজ্‌ম', প্রথম আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন স্মারক বক্তৃতা, অসম সাহিত্য সভা আয়োজিত প্রথম আনন্দরাম বরুয়া স্মারক বক্তৃতা, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. মহেন্দ্র বরা স্মারক বক্তৃতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে 'ফ্রম ইমিটেশন টু ইমাজিনেশন' প্রভৃতি।

এ-ছাড়া ২০০৫ সালে সিপাঝাড়ে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভার ৬৮তম অধিবেশনে কবিসম্মেলন উদ্‌বোধন করেন। পূর্ব ইউরোপে আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে একমাত্র ভারতীয় কবি হিসেবে ভবেন বরুয়াকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিল সাহিত্য অকাদেমি। সেবার তিনি ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ঘুরে আসেন।

ভবেন বরুয়ার পত্নী দীপা ভারতীয় মার্গ সংগীত এবং চিত্রশিল্পে পারদর্শী। দুই পুত্র অঙ্কুর ও অর্পণ উচ্চশিক্ষিত ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

২০১৪ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী শ্যামলকান্তি দাশ

জন্ম ১৯৫১ সালের ৩ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ড মেদিনীপুর জেলায় এক প্রত্যন্ত গ্রামে। বাবা পুরুষোত্তমপ্রসাদ দাশ, মা শেফালি দাশ। দুজনেই প্রয়াত। স্ত্রী শুক্লা দাশ।

শিক্ষা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহিষাদল রাজ কলেজ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (অসমাপ্ত)। কর্মজীবন শুরু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিক মাসিক 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায়। মধ্যে অল্প কিছুদিন মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা। পরে আনন্দবাজার পত্রিকা সংস্থায় যোগদান। প্রায় ২৮ বছর সাংবাদিকতার পর স্বেচ্ছা-অবসর। অতঃপর ২০০৪ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'কবির কাগজ কবিতার কাগজ' মাসিক 'কবিসম্মেলন'। সম্পাদকের সুচিন্তিত পরিকল্পনায় বিশিষ্ট কবি ও গদ্যলেখকদের সৃষ্টিশীল অবদানে সমৃদ্ধ পত্রিকাটি চোদ্দ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও সজীব এবং জনপ্রিয়তাও ক্রমবর্ধমান। ইতিমধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চির সবুজ লেখা' (পশ্চিমবঙ্গ শিশু কিশোর আকাদেমির মুখপত্র) পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায় সাড়ে তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা।

প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'পাঠশালা' পত্রিকায়, ১৩৭২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। কবিতার নাম 'এই তো আমার পণ'।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কাগজকুচি', প্রকাশ পায় ১৯৭৬ সালে।

ছোটদের কবিতায়ও শ্যামলকান্তির নিজস্বতা ও উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য প্রশংসনীয়। উপহার দিয়েছেন বেশকিছু অনবদ্য ছড়া। চমৎকার তাঁর ছন্দের জ্ঞান। বড়দের ও ছোটদের মিলিয়ে তাঁর কবিতার বইয়ের সংখ্যা ৩৫। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কাগজকুচি', 'প্রেমের কবিতা', 'ভূতের চরণে', 'আমাদের কবিজন্ম', 'সরল কবিতা', 'ছোট শহরের হাওয়া', 'দূর থেকে লিখি', 'বোকা মেয়ের জন্য', 'চলে যায় দিন', 'পুলকিত যামিনী', 'একলা পাগল', 'নির্বাচিত কবিতা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রভৃতি। বাংলাদেশেও শ্যামলকান্তির জনপ্রিয়তার প্রমাণ সেখান থেকে প্রকাশিত 'স্বনির্বাচিত কবিতা', 'বন্ধুর মুখোশে বন্ধু', 'ভেসে বেড়াবার আনন্দ', 'ঝুপসি দিদির গানের বাড়ি', 'প্রিয় ১০০ কবিতা', ও 'ধানী পটকা' (বড়দের ছড়া)।

ছোটদের জন্য লেখা তাঁর কবিতার বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'বাবুইবাবু', 'চাইছি ঘুড়ি মাঞ্জা সুতো', 'পাতায় মোড়া বাঁশি', 'পাখি সব করে রব', 'বাঘের গায়ে হলদে জামা', 'শ্রেষ্ঠ ছড়া' এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'আমপাতা জামপাতা' ও 'মনে কর ঘুমিয়ে আছিস'।

বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। 'কবিসম্মেলন' ছাড়াও তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রতীতি', 'জনপদ', 'কবিতা সংবাদ', 'কনসার্ট', 'আত্মজ' প্রভৃতি। সম্পাদিত নানা বিষয়ের বইয়ের সংখ্যা একশোরও বেশি। সম্পাদিক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই : 'হাজার কবির হাজার কবিতা', 'বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'লেখক সত্যজিৎ রায়', 'আহ্লাদে আটখানা', 'দুই বাংলার প্রাণের কবিতা', 'দুই বাংলার আবৃত্তির কবিতা', '১০০ ছড়া ১০০ ছবি', 'ছোটদের আবৃত্তির কবিতা', 'চেনা সুনীল অচেনা সুনীল', 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়' প্রভৃতি।

কবি ও কবিতা নিয়ে নানারকম কাজে শ্যামলকান্তি সর্বদাই অক্লান্ত। সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও রয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল 'সৌহার্দ্য ৭০', 'সারা ভারত কবিতা উৎসব', 'বিশ্ব বাংলা কবিতা উৎসব', 'সারা বাংলা শিশু সাহিত্য উৎসব', 'সারা বাংলা তরুণ লেখক সম্মেলন' প্রভৃতি।

অজস্র সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত। তার মধ্যে রয়েছে : জীবনানন্দ পুরস্কার, বিষ্ণু দে পুরস্কার, সাহিত্য সেতু পুরস্কার, তুষার রায় পুরস্কার, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার, 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার সাধনা চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার, লেখক সম্প্রীতি পুরস্কার (ঢাকা, বাংলাদেশ), সীমান্ত সাহিত্য পুরস্কার, নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সংসদ সম্মাননা, আনন্দ স্নোসেম পুরস্কার (শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কৃষ্ণ' কবিতার জন্য), শিবরাম চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (মালদহ), শিশু সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার, তেপান্তর পুরস্কার, ডা. ওয়াজেদ স্মৃতি পুরস্কার (ঢাকা, বাংলাদেশ), আনিকা ইউসুফজাই স্মৃতি পুরস্কার (টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ), ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি পুরস্কার, ত্রিবৃত্ত পুরস্কার (কোচবিহার, দু-বার, কবিতা ও সম্পাদনার জন্য), কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র পুরস্কার ইত্যাদি।

২০০৯ সালে পেয়েছেন ভারত সরকার প্রদত্ত 'জাতীয় কবি'র সম্মান, গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে।

দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত এবং বিদেশের বিভিন্ন সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শ্যামলকান্তির একাধিক কবিতা।

২০১৫ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী হরেকৃষ্ণ ডেকা

অসমিয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচক হরেকৃষ্ণ ডেকার জন্ম ১৯৪৩ সালে, উজান অসমের তিনসুকিয়ায়। মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত হরেকৃষ্ণ ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে ভরতি হন গুয়াহাটির ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন কলেজে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষায় স্নাতকোত্তর।

এরপর বছর তিনেক একটি কলেজে অধ্যাপনা করলেও শেষ পর্যন্ত অসম-মেঘালয় ক্যাডারের আইপিএস হয়ে অসমের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ হিসেবে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

পুলিশ-প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠান করেও হরেকৃষ্ণ ডেকা কবিতা থেকে কখনো দূরে থাকেননি। খুব ছোটবেলা থেকেই দৈনিক সংবাদপত্রে লেখালিখি করতেন। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বরবর'। এরপর লিখেছেন 'রাতির শোভাযাত্রা', 'আন এজন', 'ভাল পোয়ার বাবে এযার', 'ছানমিয়ালি বর্ণমালা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। 'আন এজন' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৮৭ সালে পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

শুধু কবিতা নয়, হরেকৃষ্ণ ডেকা অসমিয়া সাহিত্যজগতে চিরকালের জন্য স্মরণযোগ্য নাম হিসেবে থেকে যাবেন ছোটগল্পের জন্যও। তাঁর ছয়টি ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হল 'প্রাকৃতিক আরু অনন্যা', 'মধুসূদনর দলং', 'বন্দিয়ার', 'পোস্ট-মডার্ন অথবা গল্প', 'মৃত্যুদণ্ড' এবং 'গল্প আরু কল্প'। 'বন্দিয়ার' গল্পগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৯৬ সালে 'কথা' পুরস্কার পেয়েছেন।

হরেকৃষ্ণ ডেকার আলোচনাগ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। 'আধুনিকতাবাদ আরু অন্যান্য প্রবন্ধ', 'দৃষ্টি আরু সৃষ্টি', 'নীলমণি ফুকন : কবি আরু কবিতা' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি অসমিয়া সাহিত্যের হালহকিকত নিয়ে নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। এ ছাড়া লিখেছেন দুটি উপন্যাস— 'আগন্তুক' ও 'তরুণ প্রজন্মর কবিতা'।

হরেকৃষ্ণ ডেকার লেখার মূল বৈশিষ্ট্য সমাজকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। তাঁর যে-কোনো চরিত্রই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে আধুনিক সময়ের প্রতীক। কবিতা, গল্প, উপন্যাসে সবসময় পরীক্ষানিরীক্ষা করতে ভালোবাসেন তিনি।

সাহিত্য অকাদেমি ও কথা সাহিত্য পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন অসমিয়া সাহিত্যের সর্বোচ্চ সম্মান— উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার।

২০১৫ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী রত্নেশ্বর হাজরা

বাংলা কাব্যজগতে গত শতকের ছয়ের দশকের কবি রত্নেশ্বর হাজরার জন্ম অবিভক্ত ভারতের বরিশাল জেলার ভরতকাঠি গ্রামে, ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে। মাত্র ১২ বছর বয়সে পিতৃহারা বালক বাঁধনহারা হয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলেন।

১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গার অভিঘাতে উদ্‌বাস্তু হয়ে চলে আসেন কলকাতায়, আত্মীয়ের আশ্রয়ে শুরু হয় নতুন জীবন। স্কুলজীবন শেষ করে চাকরির উদ্দেশ্যে মোটর মেকানিজ্‌ম শিখতে শুরু করেন। এরপর বৃত্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের থার্মোমিটার তৈরির একটা কারখানায় কাজ শুরু করেন। কিন্তু দুটিই ছিল অসমাপ্ত। পরে কলকাতার আশুতোষ কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে চাকরিতে যোগ দেন এবং সেখান থেকেই অবসর।

কলেজ-জীবন থেকে কবিতাচর্চার শুরু। লিট্‌ল ম্যাগাজিন ছাড়া তখনকার 'ভারতবর্ষ' ও 'তরুণের স্বপ্ন' প্রভৃতি ঐতিহ্যশালী পত্রিকাতেও তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিষণ্ণঋতু' প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এর পর একে একে প্রকাশিত হতে থাকে 'লোকায়ত অলৌকিক', 'জলবায়ু', 'গতকাল আজ এবং আমি', 'এদিকে দক্ষিণ', 'রাজি আছি', 'উপত্যকায় একা', 'আছি নির্বাসিত', 'নিজস্ব মানচিত্র', 'শেখানো ছবিগুলো', 'ধুলোস্নান' প্রভৃতি। লিখেছেন ছোটদের জন্য ছড়া/কবিতার বই— 'মেঘের দিদা বরফদানা', 'রত্নমালার যাদুকর', 'সবুজ পরিকে নেমন্তন্ন', 'মাটির ঘড়া স্বপ্নে ভরা', 'অলীকপুর একটু দূর' প্রভৃতি। অনুবাদ করেছেন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও কালিদাসের 'ঋতুসংহার'। প্রকাশিত হয়েছে দুই খণ্ডে ছয়টি কাব্যনাটকের সংকলনও।

রত্নেশ্বর হাজরার কবিতায় আঙ্গিক-সচেতনতা, রহস্যময় ভৌগোলিক পরিবেশ, যতিচিহ্নহীনতা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছোটদের জন্য লেখা কবিতায় পাওয়া যায় গ্রামবাংলার জলকাদার গন্ধ, শোনা যায় সুপুরিবাগানে ঘুঘুর উদাস-করা ডাক, ছবি হয়ে ওঠে বনপিপুল, অম্লবেতস, আমলকী, শতমূলী প্রভৃতি দৃশ্যের অনুষঙ্গ।

বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন কবি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অভিজ্ঞান পুরস্কার, মহাদিগন্ত পুরস্কার, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত স্মৃতি সম্মাননা, শিশুসাহিত্য পরিষদ পুরস্কার প্রভৃতি।

২০১৬ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

সনন্ত তাঁতি

আধুনিক অসমিয়া কবিতার নীরব সাধক সনন্ত তাঁতির জন্ম ১৯৫২ সালের ৪ নভেম্বর, অসমের বাংলাদেশ-সংলগ্ন বরাক উপত্যকায় করিমগঞ্জ জেলার কালীনগর চা-বাগানে। ওড়িয়াভাষী চা-বাগান শ্রমিকের সন্তান সনন্ত নিকটবর্তী শহর রামকৃষ্ণনগরে বড় হয়ে ওঠেন। পরে শৈলশহর শিলঙে পড়াশোনা এবং ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি লাভ।

ছেলেবেলাতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে। স্বভাবতই এই ভাষার প্রেমে পড়েন, যা আজও অম্লান। তাঁর প্রথম রচনাও বাংলা ভাষায় লেখা একটি প্রেমের কবিতা। যৌবনে যোরহাটে বসবাসকালে তিনি অসমিয়া ভাষার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে এই ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা উপলব্ধি করেন, যা অসমিয়া সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে এবং এই ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। সনন্ত এমন একজন কবি যাঁর মাতৃভাষা ওড়িয়া, শিক্ষা বাংলা মাধ্যমে আর কবিতা রচনা অসমিয়া ভাষায়— নিঃসন্দেহে এ এক বিরল কৃতিত্ব। সাম্যবাদী ভাবধারায় পুষ্ট তাঁর জীবন ও সংবেদনশীলতা আশির দশকে অসমের রাজনৈতিক অস্থিরতার দিনগুলিতে তাঁর কবিতায় জুগিয়েছিল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

সনন্তের অসমিয়া কবিতা-সংকলনের সংখ্যা তেরো। তাঁর কবিতার স্বাতন্ত্র্য যেমন পাঠকের ভালোবাসা অর্জন করেছে তেমনই সমালোচকদের দ্বারাও উচ্চপ্রশংসিত। তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'উজ্জ্বল নক্ষত্রর সন্ধানত' প্রকাশ পায় ১৯৮১ সালে, চার বছর পরে বেরোয় দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মই মানুহর অমল উৎসব'। সনন্তের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'নিজর বিরুদ্ধে শেষ প্রস্তাব' (১৯৯০), 'শব্দত অথবা শব্দহীনতাত' (১৯৯৩), 'মৃত্যুর আগর স্টপেজত' (১৯৯৬), 'টেপনিতো কেতিয়াবা বারিষা আহে' (১৯৯৭), 'ধুঁয়া ছাইর সপোন' (১৯৯৯), 'দীর্ণ বসন্তর সৌরভ' (২০০২), 'আপুনি আপোনার স'তে যুদ্ধ করিব পারিবনে' (২০০৪), 'মই' (অর্থাৎ 'আমি', ২০০৮), 'মোর নিরাভরণ আত্মার শোকাবহ শব্দবোর' (২০১০), 'কাইলর দিনটো আমার হ'ব' (২০১৩)। গত মাসে (ফেব্রুআরি, ২০১৭) প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ত্রয়োদশ অসমিয়া কাব্যগ্রন্থ 'মোর প্রিয় সপোনর ওচরে-পাঁজরে' আর তাঁর কবিতার দিব্যজ্যোতি শর্মা কৃত ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ 'Selected Poems'.

সার্ক-ভুক্ত দেশগুলির লেখকদের সম্মেলন সহ বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে যোগ দিয়েছেন সনন্ত। তিনি ইতিমধ্যেই যে-সব পুরস্কারে ভূষিত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৯২ সালে অসম কবি সমাজ প্রদত্ত মৃণালিনী দেবী গোস্বামী পুরস্কার, ২০০২ সালে বীর বিরসা মুন্ডা পুরস্কার, ২০১১ সালে চর চাপোরি সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত ওসমান আলি সদাগর সমন্বয় পুরস্কার, ২০১৪ সালে ক্রান্তিকাল পুরস্কার, ২০১৫ সালে অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত নিজরা কবি শৈলধর রাজখোয়া পুরস্কার এবং ২০১৬ সালে এপিপিএল প্রদত্ত শিরিষ-অয়েল সাহিত্য পুরস্কার। এর পরে পেয়েছেন উইলিয়ামসন মেগর প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (২০১৭), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (২০১৮), যোরহাট কলেজ থেকে প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে 'মহাজোসিয়ান' সম্মান (২০১৯) এবং মেঘরাজ কর্মকার সাহিত্য পুরস্কার (২০২০)।

অসম সরকারের শ্রম দপ্তরের অধীন চা-শ্রমিকদের পেনশন ও প্রভিডেন্ড ফান্ড সংক্রান্ত অর্ধ-সরকারি সংস্থা থেকে ২০১২ সালে ডেপুটি পিএফ কমিশনার হিসেবে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন সনন্ত, তার পরও ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত ওই সংস্থায় অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি হিসেবে কাজ করেছেন।

সনন্ত ২০২১ সালের ২৫ নভেম্বর প্রয়াত।

২০১৬ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী উদয়ন ঘোষ

জন্ম ১৯৪৩ সালে। বাল্য, কৈশোর, যৌবন কেটেছে ইমফল, শিলচর, গুয়াহাটি আর শিলঙে। ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতা লেখেন উদয়ন, পরবর্তীকালে প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি অনুবাদও করেছেন। কর্মজীবন কেটেছে শিলং কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী কিশোরীমোহন পাঠক আর পরশকুমার চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে অল্পস্বল্প গবেষণাও করেছেন।

বর্তমানে কলকাতা নিবাসী উদয়ন একসময়ে শিলচরের বিখ্যাত কবিতা-পত্রিকা 'অতন্দ্র'-র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন ১৯ বছর। যখন যেখানে থাকেন সেখানেই ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে কবিতা নিয়ে আলোচনা তাঁর অন্যতম নেশা। মার্ক্সবাদী রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব ভাষার নির্বাচিত কবিতা সংকলন করে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, সংকলনটি সাহিত্য অকাদেমি থেকে প্রকাশ পেয়েছে। উদয়নের কিছু-কিছু অনুবাদ পেঙ্গুইন-এর এক সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ইতিমধ্যে উদয়নের যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ঝোপ জঙ্গলের কবিতা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'কমলকুমার বোধিনী-১', 'হরিশ্চন্দ্র' (বনসাই উপন্যাস) আর 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর দেড়শো বছর'। এ-ছাড়াও রয়েছে 'অর্কিড উপত্যকার ভালোবাসার গান', 'নাগা পাহাড়ের গান', 'পয়েন্টেলিস্টের আত্মকথা', 'কমলকুমার বোধিনী-২', 'উড়ো কবিতার ঝুড়ো ফুল', সংলাপ কাব্য 'রক্ত সিংহাসন' ও 'ব্ল্যাকহোল রেডিয়েশন', প্রবন্ধ সংকলন 'একথা, ওকথা, মাতকথা' এবং 'সলোমনের গান'।

হাইলাকান্দির 'সাহিত্য' পত্রিকার পক্ষ থেকে সম্মান লাভ করেছেন ২০০৭ সালে।

২০১৭ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী সমীর তাঁতী

কবি সমীর তাঁতীর জন্ম বেহোরা চা বাগানের মিকিরচাঙে, ১৯৫৫ সালে। স্থানীয় রাজবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন প্রথম বিভাগে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের পড়াশোনা করার সময় তাঁর পরিচয় ঘটে অসমিয়া সাহিত্যের দিকপাল হীরেন গোহাঁই, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও গোবিন্দপ্রসাদ শর্মার সঙ্গে। যাঁরা ছিলেন তাঁর শিক্ষক।

সমীর তাঁতী কর্মজীবন শুরু করেন 'সাদিনিয়া নাগরিক' কাগজে সহকারী সম্পাদক রূপে। যাঁর সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক হোমেন বরগোহাঞি। সেই সময় প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা 'অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে'।

এর পর দুর্গেশ্বর দত্ত নিয়মিত সমীর তাঁতীর কবিতা প্রকাশ করতেন তাঁর পত্রিকা 'পান্থদীপ'-এ। কর্মজীবনে থিতু হওয়ার আগে সমীর তাঁতী কাজ করেছেন চাংসারির শরাইঘাট কলেজে লেকচারার হিসেবে, খানাপাড়ার গণেশ মন্দির বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে, অসম সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের অনুবাদক রূপে, দেড় বছর কাজ করেছেন ইংরেজি দৈনিক 'দ্য সেন্টিনেল' পত্রিকায় প্রুফরিডার হিসেবে। ১৯৮৪ সালে যোগ দেন অসম সরকারের পর্যটন বিভাগে। এবং সেখান থেকেই ২০১৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে।

এ-যাবৎ সমীর তাঁতীর তেরোটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ-ছাড়া রয়েছে সাহিত্য ও সমালোচনামূলক চারটি গ্রন্থ, আফ্রিকার কবিতা ও প্রেমের গান এবং জাপানের ভালোবাসার কবিতা নামক দুটি অনুবাদ গ্রন্থ, দুটি সম্পাদিত ছোটগল্প সংকলন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হল 'যুদ্ধভূমির কবিতা' (১৯৮৫), 'কদম ফুলর রাতি' (২০০১), 'শোকাকুল উপত্যকা' (১৯৯০), 'সময় শব্দ সপোন' (১৯৯৬) প্রভৃতি।

২০১২ সালে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় মর্যাদাসম্পন্ন অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার। ছগনলাল জৈন সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি কর্তৃক সংবর্ধিত সমীর তাঁতী ১৯৮৭ সালে অংশগ্রহণ করেন ভোপালে আয়োজিত ইন্ডিয়ান পোয়েট্রির প্রথম অধিবেশনে। ভোপাল সহ দেশের বিভিন্ন শহরে তিনি যোগ দিয়েছেন সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠানে। এর মধ্যে রয়েছে কলকাতা, নতুন দিল্লি, পাটনা, মুম্বাই, কোচি, ভুবনেশ্বর, কোণার্ক প্রভৃতি শহর।

২০১৭ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী অজিত বাইরী

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কনকপুর গ্রামে ১৯৪৮ সালের ৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন কবি অজিত বাইরী। স্কুল-হোস্টেলে মাঝরাতে লণ্ঠনের আলোয় প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন অকালপ্রয়াত মায়ের স্মৃতিতে।

কৈশোরোত্তীর্ণ দিনগুলিতে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল কারখানার ফাইফরমাস খাটার কর্মী ও পরে হাওড়া স্টেশনে কুলি-কামিনদের রেশনের মাল খালাসের হিসাবরক্ষক হিসেবে। ১৯৭১-এ সরকারি চাকরিতে যোগ দেন তিনি। ২০০৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের উপ-প্রকল্প অধিকর্তা (কৃষি) পদ থেকে অবসরগ্রহণ।

নকশাল আন্দোলনের সময়ে তিনি ছিলেন পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন। দেশে জরুরি অবস্থা চলাকালীন কবি-সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্তকে স্বগৃহে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হতে হয় কবি অজিত বাইরীকে।

অজিত বাইরীর এ-যাবৎ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ২৬টি, উপন্যাস দুটি, গল্প সংকলন একটি, স্বরচিত কবিতার আলোচনাগ্রন্থ একটি, আত্মকথামূলক গদ্যগ্রন্থ একটি, দুই বাংলার কবিদের নিয়ে এবং অন্যান্য সম্পাদিত কবিতার সংকলন সাতটি।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হলো 'রাঢ়ের মাটি, দক্ষিণের নোনা হাওয়া', 'বিদায় কোভালাম বিদায় সূর্যাস্ত', 'প্রিজনভ্যান এবং কালপুরুষ', 'হরীতকী বনের রোদ', 'সন্ধ্যাতারার মতো মেয়েটি', 'আগুনের চাদর', 'শব্দের টেরাকোটা', 'ধুলো থেকে তুলে নেব স্তব', 'পরিব্রাজকের ঝুলি', 'অর্ধেক আকাশ তুমি', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রভৃতি। সম্পাদিত পত্রিকা : প্রতিমুখ (১৯৮০-১৯৮৬), কৃত্তিকা (২০০৮-২০১০)।

কবি ও প্রাবন্ধিক তপনকুমার মাইতি সম্পাদিত 'সির্জন নদীর কবি : অজিত বাইরী' গ্রন্থে কবির কাব্যের মূল্যায়ন করেছেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলরতন সেন, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল প্রমুখ বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক।

কবিতার পাশাপাশি অজিত বাইরী একজন কৃষি-বিশেষজ্ঞ। চাকরিসূত্রে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল। নোনা ভূমিতে আধুনিক কৃষিকর্ম কীভাবে করা যায় সেসব হাতেকলমে তিনি শিখিয়েছেন কৃষকদের।

২০১৮ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী অনুভব তুলসী

অসমিয়া কাব্যজগতে অনুভব তুলসী উজ্জ্বল এক ধ্রুবতারা। নগাঁওয়ের তুলসীমুখে ১৯৫৮ সালে জন্ম এই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নাজমা'। একটি বাক্যে তাঁর কবিতার মূল সুরকে ধরা যায় না, এটাই কবির বৈশিষ্ট্য। জীবনের প্রতি ভালোবাসা যদি হয় তাঁর কবিতার অনন্য সুর, তাহলে আঞ্চলিকতার পাশাপাশি বিশ্বজনীনতা আরেকটি প্রধান উপাদান। কল্পনা, পুরাণ, লোকজ উপাদান, প্রেম, সমাজমনস্কতা পাশাপাশি খেলা করে তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিতে।

প্রখ্যাত কবি, সমালোচক কে সচ্চিদানন্দ লিখেছেন, 'অনুভব তুলসীর কবিতা গভীর ও সৎ; একইসঙ্গে স্থানিক ও বিশ্বজনীন। চমৎকার লিরিকের পাশাপাশি বর্তমান ও অতীতের দার্শনিকতা তাঁর কবিতায় দৃষ্ট।'

'ইন্ডিয়ান লিটারেচার'-এর সম্পাদক এ জে টমাস বলেছেন, 'অনুভব তুলসীর কবিতা আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ব্যক্তির অনন্যতার দিকে। কী বিষয় তিনি লিখছেন সেটা কথা নয়, যা-ই লিখুন-না কেন, তার থেকে সবচেয়ে বেশি নির্যাস তুলে আনেন তিনি।'

এটা লেখা অত্যুক্তি হবে না যে অনুভব তুলসী অসমিয়া কবিতায় নতুন বেঞ্চমার্ক তৈরি করেছেন। 'নাজমা' প্রকাশের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে কবিতায় ফর্ম ও কনটেন্ট নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন তিনি। কল্পনার সঙ্গে বাস্তব, আধুনিকতার সঙ্গে পুরাণ, গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে শহুরে জীবনের অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটেছে তাঁর কবিতায়।

শুধু কাব্যগ্রন্থই নয়, বেশ কয়েকটি সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক কবিতা সম্মেলনে অংশগ্রহণের সূত্রে বাংলাদেশের ঢাকা, তুরস্কের ইস্তাম্বুল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন, টেক্সাস, গ্রিসের এথেন্স প্রভৃতি স্থানে পদার্পণ ঘটেছে তাঁর।

শুধু কবিতা বা সমালোচনা নয়, চলচ্চিত্র সম্পর্কেও অত্যন্ত আগ্রহী অনুভব তুলসীর চলচ্চিত্র বিষয়ক সমালোচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য।

অনুভব তুলসীর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'দিন রাতির দুয়ারী', 'জুই চোর', 'জয় জয়তীর জয়', 'চরাইর চকুত ফুলর বিছনা', 'পানীকাউরী', 'জীবনানন্দর দেহান্তরর দৃশ্য', 'দেও চেলেং', 'বরষুণর খেতিয়ক' প্রভৃতি।

কাব্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ : অসমিয়া কবিতা আরু তুলনামূলক অধ্যয়ন, সৃষ্টি সুষমা, ইলোরার ইন্দ্রসভা।

গল্প সংকলন : গোলাপ গছত থৈ যাবি।

চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখালিখি : বর্ণ কল্প, নিউ ওয়েভ ফ্রেঞ্চ সিনেমা : জাঁ লুক গদার।

সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ : জয় জয়ন্তী, অমূল্য বরুয়ার কবিতা, তরুণ প্রজন্মর কবিতা।

সম্পাদিত গবেষণামূলক জার্নাল : কনফ্লুয়েন্স, ডিসকোর্স।

বিভিন্ন সম্মান ও পুরস্কারে সম্মানিত কবি গ্রিসের এথেন্সে অষ্টম বার্ষিক আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এ ছাড়া অসম সাহিত্য সভার শিবসাগর ও হোজাই অধিবেশন, ঢাকায় জাতীয় কবিতা উৎসব, নতুন দিল্লিতে সার্ক সাহিত্য উৎসব, তুরস্কে রাইটার্স ও লিটারেরি ট্রান্সলেটর্স ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এরপর পেয়েছেন জমিরুদ্দিন আহমেদ সাহিত্য পুরস্কার (২০১৯) এবং অসম কেশরী অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী পুরস্কার (২০২০)।

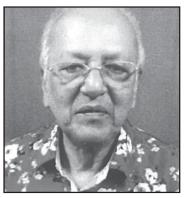

২০১৮ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী পীযূষ রাউত

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতাচর্চার জগতে পীযূষ রাউত অনন্য। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টের মেহেরপুরে ১৯৪০ সালে জন্ম, কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে, 'বিষণ্ণ উদ্যানে বৈশাখ'। কবিতা লেখার শুরু হয়েছিল ছাত্রাবস্থায়। মাত্র তেইশ বছর বয়সে কবিতার কাগজ সম্পাদনা করেন। ত্রিপুরার প্রথম কবিতা-পত্রিকা 'জোনাকি' প্রকাশিত হয় তাঁরই সম্পাদনায়। চলেছিল ১৯৬৩-৭৭ পর্যন্ত। এখানেই শেষ নয়, ত্রিপুরার প্রথম গল্প-পত্রিকা 'স্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্ন'ও তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৯-৭৪ পর্যন্ত। একইসঙ্গে তিনি সম্পাদনা করেছেন কবিতা ও গল্পের কাগজ। এ ছাড়া সম্পাদনা করেছেন আরও কয়েকটি পত্রিকা, সেগুলি হলো 'খোয়াই', 'অরণ্যে আমরা', 'সবিনয় নিবেদন'।

পীযূষ রাউতের কবিতার নির্মাণ শুরু হয় কোনো তাৎক্ষণিক ঘটনা থেকে, ক্রমশ পৌঁছে যায় তা অমরত্বের আঙিনায়। ফুটে ওঠে নাগরিক মানুষের জীবনযন্ত্রণা, ক্ষোভ ও ক্রোধ। পাশাপাশি জীবনকে যাপন, সমাজজীবন ও ভালোবাসার পরশও পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়।

পীযূষ রাউত সমাজমনস্ক কবি। স্বাভাবিকভাবে তাঁর কবিতায় সমাজচেতনা অবশ্যম্ভাবীরূপেই জড়িয়ে থাকে। প্রকৃতির রূপবর্ণনা কিংবা নর-নারীর স্বাভাবিক প্রেম নয়, এই কবির কবিতা কিছু বলতে চায়, যা পাঠকের মনে রেখে যায় গভীর ছাপ।

তাঁর এ-পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হল— বিষণ্ণ উদ্যানে ; জন্ম জুয়াড়ী ; নষ্ট আশ্বিনের মেঘ ; প্রিয় কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত পঙ্‌ক্তিমালা ; অবসরের আগে ও পরে ; মন্ত্রপূত রুমাল ; স্যার, আপনার টেলিফোন; তোর্ষা সিরিজ ; শ্রীচরণেষু বাবা ; চিনিকম; হ্যালো চীফ্ মিনিষ্টার ; জয় হে ; আমরা কয়েকজন ; আমার অণুকবিতা ; জোনাকি সমগ্র ; ইতি তোমারই।

পীযূষ রাউত ছোটগল্পে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর 'অরুণের আত্মসমীক্ষা ও অন্যান্য গল্প' পড়লেই তার রেশ পাওয়া যায়। এ ছাড়া তিনি লিখেছেন আত্মকথা— 'আমার কবিজীবন'।

দীর্ঘ কাব্যজীবনে বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সংবর্ধনা পেয়েছেন পীযূষ রাউত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য — পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কবিতা উৎসবে সংবর্ধনা, ত্রিপুরায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাহিত্য সম্মেলনে সংবর্ধনা, সাহিত্য সেতু পুরস্কার, ত্রিপুরা সরকার প্রদত্ত 'কবি সুকান্ত পুরস্কার', প্রবাহ সাহিত্য সম্মান, নন্দিনী স্মৃতি সাহিত্য সম্মান, নন্দিত প্রিয়জন সম্মান, শিলচরের বরাকবার্তা প্রদত্ত কবিরত্ন সম্মান প্রভৃতি।

বাংলাভাষার গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব কবিতা-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেশ, কৃত্তিবাস, প্রতিক্ষণ, কবিসম্মেলন, বিভাব প্রভৃতি।

২০১৯ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী নীলিম কুমার

পেশায় চিকিৎসক হলেও আধুনিক অসমিয়া কবি হিসেবে নীলিম কুমার যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর জন্ম ১৯৬১ সালে, প্রথম কবিতা লেখেন একুশ বছর বয়সে। তাঁর কবিতায় সুররিয়ালিজ্‌ম-এর সঙ্গে পাওয়া যায় স্বপ্নের উদ্ভাস। কবিতা ছাড়াও উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনায় তিনি নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

নীলিম কুমারের কবিতা-গ্রন্থের সংখ্যা সতেরো, সেইসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে তিনটি উপন্যাস ও একটি প্রবন্ধ-সংগ্রহ। তাঁর কবিতা যেসব ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় অনূদিত তার মধ্যে রয়েছে হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠি, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, উর্দু, বাংলা, মালয়ালম, ওড়িয়া, নেপালি, ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ ও ইংরেজি।

তাঁর দুটি ইংরেজি কবিতা-সংকলনের নাম 'প্রস্টিটিউট মুন অ্যান্ড আদার পোয়েম্‌স' এবং 'সানশাইন হ্যাজ নো হোম'। বেঙ্গালুরু বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে তাঁর কবিতা অন্তর্ভুক্ত।

কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভুবনেশ্বরের ধৌলী বুক্‌স থেকে নীলিমের কবিতার দুটি হিন্দি সংকলন প্রকাশিত। অন্যান্য যেসব সংকলনে তাঁর কবিতা স্থান পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে 'সং ফ্রম দ্য সিশোর' (পোয়েট্রি ফ্রম দ্য ইন্ডিয়ান ওশন), 'ওআন হানড্রেড ইন্ডিয়ান পোয়েট্‌স', 'ইন্ডিয়া ইন ভার্স', 'ড্যান্সিং আর্থ' (পেংগুইন বুক্‌স), 'কবি ভারতী', '১০০ গ্রেট ইন্ডিয়ান পোয়েট্‌স' প্রভৃতি।

'ইন্ডো-ফ্রেঞ্চ কালচারাল রিলেশন্স'-এর অধীনে তিনি ভারতীয় কবি হিসেবে ফরাসি দেশে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এ-ছাড়াও সাহিত্য অকাদেমির উদ্যোগে আয়োজিত কবিসম্মেলনে বাংলাদেশ ও লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণ করেছেন। তিনি যেসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কবিতা-উৎসবে যোগ দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সার্ক পোয়েট্রি ফেস্টিভ্যাল, আইওআরএ ফেস্টিভ্যাল, কেরল সাহিত্য উৎসব, ওএএলএফ ফেস্টিভ্যাল, কালা ঘোড়া আর্ট ফেস্টিভ্যাল, কবি ভারতী (ভোপালের ভারত ভবনে), আকাশবাণী আয়োজিত জাতীয় কবিসম্মেলন, সার্ক রাইটার্স কনফারেন্স, ব্যাঙ্গালোর পোয়েট্রি ফেস্টিভ্যাল, দিল্লিতে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে সৃষ্টিশীল সম্প্রদায়ের মিলনোৎসব। সাহিত্য আকাদেমি আয়োজিত প্রায় ৪০টি কবিসম্মেলনে তিনি এ-পর্যন্ত অংশ নিয়েছেন।

নীলিম কুমার ভোপালের ভারত ভবন-এর উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য।

কবি হিসেবে তিনি বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মানের অধিকারী। পেয়েছেন উদয় ভারতী জাতীয় পুরস্কার, ডিস্টিংগুইশ্‌ড লিডারশিপ অ্যাওআর্ড (ইউএসএ), রাজা ফাউন্ডেশন পুরস্কার, শব্দ পুরস্কার, একা এবং কয়েকজন সম্মান এবং মানব সম্পদ বিকাশ ফেলোশিপ।

২০১৯ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী রণজিৎ দাশ

জন্মসূত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হলেও রণজিৎ দাশ বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট কবি হিসেবে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় তাঁর সুস্পষ্ট নাগরিক কণ্ঠস্বরে যুক্ত হয়েছে এক নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গি।

রণজিতের জন্ম অসমের শিলচর শহরে, ১৯৪৯ সালে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. পাশ করার পরে কলকাতায় গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে। ২০০৬ সালে সেই চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে পত্নী ও এক পুত্র সহ স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করছেন। ফুটবল যেমন তাঁর প্রিয় খেলা তেমনই বিশেষ আগ্রহের বিষয় ফিল্ম ও দর্শনশাস্ত্র।

এ পর্যন্ত রণজিতের বাংলা কবিতার এগারোটি সংকলন প্রকাশিত। সেগুলি যথাক্রমে 'আমাদের লাজুক কবিতা' (১৯৭৭), 'জিপসিদের তাঁবু' (১৯৮৪), 'সময়, সবুজ ডাইনি' (১৯৮৭), 'বন্দরের কথ্যভাষা' (১৯৯৩), 'ঈশ্বরের চোখ' (১৯৯৯), 'সন্ধ্যার পাগল' (২০০৪), 'সমুদ্র সংলাপ' (২০০৭), 'শহরে নিস্তব্ধ মেঘ' (২০১০), 'ধানখেতে বৃষ্টির কবিতা' (২০১৩), 'অসমাপ্ত আলিঙ্গন' (২০১৬), এবং 'বিষাদসিন্ধুর কিছু লেখা' (২০১৮)। এ ছাড়াও রয়েছে 'বিয়োগপর্ব' (১৯৯৭) এবং 'শ্যামাপোকা' (২০০০) নামে দুটি উপন্যাস আর সাহিত্য-সম্পর্কিত দুটি প্রবন্ধ-সংগ্রহ ('খোঁপার ফুল বিষয়ক', ২০০৬ এবং 'কবিতার দ্বিমেরুবিশ্ব', ২০১১)।

বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা রূপা অ্যান্ড কোং থেকে 'আ সামার নাইটমেয়ার অ্যান্ড আদার পোয়েম্‌স' নামে রণজিতের কবিতার ইংরেজি অনুবাদের একটি সংকলন প্রকাশ পেয়েছে ২০১১ সালে।

রণজিতের সম্পাদনায় 'বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামে বড়সড় একটি কবিতা-সংকলন ২০০৯ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত।

বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মানের অধিকারী রণজিৎ, যার মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির পুরস্কার এবং রবীন্দ্র পুরস্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে কবিতা পাঠ করেছেন। ভারত-ক্রোয়েশিয়া সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রোগ্রামের অধীনে এক সাহিত্যিক সফরে ক্রোয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন ২০১২ সালে।

২০২১ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী আনিছ উজ জামান

জনপ্রিয় অসমিয়া কবি আনিস উজ জামান-এর জন্ম শিবসাগর জেলার অন্তর্গত বামুনবাড়ি গ্রামে, ১৯৪৭ সালের ৩ ফেব্রুআরি। তাঁর পিতামাতা প্রয়াত দাউদ শ্বাহ আর প্রয়াত বদিরা খাটুন। শ্রীজামান ১৯৭১ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসমিয়া ভাষা-সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। প্রায় এগারো বছর মির্জা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর অসম লোক সেবা আয়োগ-এর সদস্যপদ অলংকৃত করেন। তিনি বেশ কয়েকটি কাব্যসংকলন ও গদ্যগ্রন্থের রচয়িতা। এ ছাড়াও তাঁর কবিতা ও গীতের দুটো শ্রাব্য ক্যাসেট রয়েছে।

তাঁর কবিতা বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, তামিল ছাড়াও ইংরেজি, ফরাসি ও স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় অনূদিত তাঁর কবিতা-সংকলনটির নাম 'আনিস উজ জামানের কবিতা'। অসমিয়া কবিতার বইগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'অজ্ঞাতে', 'গধূলি', 'সেউজিয়া জোন', 'এই বাটেদিয়েই দোকমোকালি', 'নৈখন কলৈ গৈছে তুমিও নেজানা মইও নেজানো', 'নির্বাচিত কবিতা' (এটি ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পাঠ্য)। এ ছাড়া রয়েছে জাপানি হাইকুর অনুবাদ 'ধুমুহার পাছত' এবং হিন্দিতে অনূদিত 'হরা চান্দ'।

সৃষ্টিশীল রচনা ছাড়াও তিনি যেসব গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে 'জনচেতনার কবি রাম গগৈ', 'অমূল্য বরুয়া দৃষ্টি আরু দর্শন', 'শব্দহীন বর্ণমালা', 'প্রজ্ঞা সিন্ধু কবি মফিজুদ্দিন' (এটি গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পাঠ্য), 'সাত সমুদ্রত শংখ বাজিছেনে নাই', জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি নীলমণি ফুকন সম্পর্কিত রচনা। রাজীব বরার সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন পার্বতীপ্রসাদ বরুয়ার বিষয়ে 'খেল ভঙা খেল' এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা প্রমথেশ বরুয়া সম্পর্কে 'রাজহাউলির পরা ছবিগৃহলৈ'। এর বাইরে রয়েছে ছোটদের জন্য পাঁচটি গ্রন্থ।

তাঁর কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচক হীরেন গোহাঁই বলেছেন, নিতান্ত ঘরোয়া ভাষা আর পরিচিত পরিবেশ থেকে গড়া চিত্রকল্প দিয়ে আনিছ উজ জামান তাঁর কবিতায় প্রাণসঞ্চার করেছেন। সাধারণ শব্দগুলোও হয়েছে ইঙ্গিতমুখর ও বাঙ্ময়। তিনি বেশকয়েকটা অবিস্মরণীয় সার্থক কবিতা উপহার দিয়েছেন। তাঁর কবিতা আধুনিক অসমিয়া কাব্য-পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তা সত্ত্বেও এক স্পষ্ট, অনন্য নতুন ধারার জন্ম দিয়েছে।

'অসম সাহিত্য সভা'-র আজীবন সদস্য আনিছ উজ জামান সারা অসম কবি সম্মেলনের প্রাক্তন সভাপতি। তিনি বর্তমানে গুয়াহাটির স্থায়ী বাসিন্দা এবং ইতিমধ্যে যেসব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত তার মধ্যে রয়েছে 'সাহিত্য জ্যোতি', 'কাব্য হৃদয়', 'একুশে সম্মান', 'কবি অনুপম কুমার অনুবাদ পুরস্কার', 'ড. ধ্রুবজ্যোতি বরা সাহিত্য পুরস্কার' এবং মেঘালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'রাইটার্স এক্সেলেন্স অ্যাওআর্ড'।

২০২১ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী কালীকৃষ্ণ গুহ

কিরণচন্দ্র ও আশালতার সন্তান কালীকৃষ্ণ গুহ-র জন্ম অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর (বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশে রাজবাড়ি) জেলার ছাইবাড়িয়া গ্রামে, ১৯৪৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। শৈশবে পিতৃবিয়োগ ঘটায় এবং দেশভাগের কারণে বাল্যজীবন অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে কেটেছে। গ্রামের বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে রাজবাড়ি শহরে এসে মাসির বাড়িতে থেকে গোয়ালন্দ হাই স্কুলে দু-বছর পড়ার পর কালীকৃষ্ণকে কলকাতায় চলে আসতে হয় ১৯৫৭ সালে। তার পর থেকে ওই মহানগরেই তাঁর স্থায়ী বসবাস।

১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে করণিক হিসেবে চাকরিজীবন শুরু করেন কালীকৃষ্ণ। কিছুদিন পরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি রাজ্য সিভিল সার্ভিসে (ডব্লিউ বি সি এস) যোগ দেন। কলা ও আইনে স্নাতক কালীকৃষ্ণ যোগ্যতার সঙ্গে আমলার দায়িত্ব পালন করে উপ সচিব হিসেবে স্বেচ্ছাবসর নেন ২০০২ সালে।

তাঁর কবিতাচর্চার শুরু গত শতকের ষাটের দশকের সূচনায় কলেজজীবনের প্রারম্ভে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রক্তাক্ত বেদীর পাশে' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। এখন পর্যন্ত কালীকৃষ্ণের প্রকাশিত কাব্যসংকলনের সংখ্যা পঁচিশ, এ-ছাড়া রয়েছে দুটি কাব্যনাটক, একটি গল্প-সংকলন আর বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচটা গদ্যগ্রন্থ। দে'জ থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' এবং ঋক প্রকাশন বের করেছে কবিতাসংগ্রহের দুটি খণ্ড। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ('নির্বাসন নাম ডাকনাম', ১৯৭২) প্রকাশের মধ্যে ব্যবধান পাঁচ বছরের। তার পর থেকে প্রতিটি দশকেই কালীকৃষ্ণের একাধিক বই প্রকাশ পেয়েছে।

কালীকৃষ্ণের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'হে নিদ্রাহীন' (১৯৮৮), 'অন্ধত্বের প্রশ্নে জড়িত' (১৯৯১), 'খণ্ডিত সেই সূর্যোদয়' (১৯৯৪), 'অক্ষয়বটের দেশ পার হই' (১৯৯৭), 'গতজন্মের গ্রীষ্মকাল' (২০০১), 'অপার যে বিস্মরণ' (২০০৬), 'মলিন পাঠগ্রহণ' (২০১০), 'মালেকমাঝির ঘাট' (২০১৩)। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর চারটে কবিতা-সংকলন— 'বাড়িটা অন্ধকার হয়ে আছে', 'অস্তমিত পানাহার', 'তোমার অনুপস্থিতির পাশে', 'এই বিচরণভূমি'। আর সম্প্রতি প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'গতজন্মের কথা' (বাল্যস্মৃতি), 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' (নিবন্ধ), 'হেমন্তে আয়োজিত পাঠ' (প্রবন্ধ), 'অক্ষয়বটের দেশ' (প্রবন্ধ) এবং 'পিপুলগাছ থেকে পরিমল সোমের প্রশ্ন ও নীরবতা' (গল্প-সংকলন)।

অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত কালীকৃষ্ণ নিরীশ্বরবাদী অথচ কল্যাণভাবাশ্রয়ী, এই কবি প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজে পান সামগ্রিক সৃষ্টিরহস্য। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও যুক্তিবাদী মননের প্রেক্ষিতে রয়েছে এই মহাবৈশ্বিক প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আস্থা অপরিসীম, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তিনি খুঁজে পান কবিতা ও সংগীতের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়। সেইসঙ্গে কালীকৃষ্ণ বিশ্বাস করেন, যে-কোনো লেখক ও শিল্পীরই থাকা উচিত সেই অহংকার যা আত্মরক্ষার সহায়ক, এবং সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার সময়ে সমস্ত রকম হিংসা পরিত্যাজ্য। কাব্যকৃতির জন্য তিনি একাধিক ছোট পত্রিকা থেকে সম্মাননা লাভ করেছেন।

২০২২ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী রবীন্দ্র সরকার

অসমিয়া কবি হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করলেও রবীন্দ্র সরকার জন্মসূত্রে বাঙালি। তাঁর জন্ম গুয়াহাটিতে, ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)। বাবা অপূর্বকুমার সরকার, মা সুনীতি সরকার, স্ত্রী শেফালি সরকার এবং আত্মজা চন্দনা রায় স্কুল-শিক্ষিকা। গুয়াহাটির বাঙালি উচ্চ-বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর গুয়াহাটিরই বি. বরুয়া কলেজ থেকে আই. এ. এবং তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দমদম মতিঝিল কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন রবীন্দ্র সরকার।

সাময়িকভাবে স্কুল-শিক্ষকতা ও ব্যাংকে কাজ করার পরে তিনি ভারতীয় জীবন বিমা নিগমে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন এবং ওই সংস্থা থেকেই অবসর নেন।

আজীবন কবিতার সাধনায় মগ্ন থাকলেও তিনি প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক হিসেবেও সক্রিয় ছিলেন এবং এই দুটি ক্ষেত্রেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও অবদান অনস্বীকার্য।

তাঁর অসমিয়া কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'বৃত্ত ভঙার সময়', 'সত্তরর পদাতিক', 'শান্তি কল্যাণ কবিতা', 'নিজনত রাতির শব্দ', 'মৌনতার শব্দ', 'অরূপ কথার জঁকা', 'কালান্তরর কবিতা', 'ধূলিয়রি ভরির সাঁচ', 'দিচাং মুখর পেঁপা', 'তুমি মোক স্পর্শ করা' আর বাংলা কবিতা-সংকলন 'খসেছে শৌখিন পালক'। তাঁর অনুবাদ কাব্যগুলি হলো 'প্রিজন ডায়েরি', 'নাজিম হিকমতের দুষ্প্রাপ্য কবিতা', 'ইয়ানিজ রিৎসসের কবিতা', 'ফয়েজ আহ্‌ম্মদ ফয়েজ-এর কবিতা', 'নিকোলাস গিয়েনের কবিতা', 'কস্টিস পাপংগোসের কবিতা' 'নীলমণি ফুকনের কবিতা' প্রভৃতি। প্রবন্ধগ্রন্থ — 'চিন্তা আরু মনীষা', 'অন্তরঙ্গ অনুভব', 'লেখকর অভিপ্রায় আরু কালচেতনা', 'চেতনার বৈভব', 'কালপুরুষের তরবারি' (বাংলা প্রবন্ধ-সংকলন)। অসমিয়া ভাষায় আত্মকথা 'দিন বোর মোর সোণর সঁজাত। অসমিয়া ও বাংলা মিলিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট চল্লিশ।

যেসব সম্মান ও পুরস্কারে রবীন্দ্র সরকার ইতিমধ্যেই ভূষিত তার মধ্যে রয়েছে রঘুনাথ চৌধুরী পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, দামল সম্মান এবং নবকান্ত বরুয়া সম্মান।

প্রয়াণ : ২ সেপ্তেম্বর ২০২৩ তারিখে।

২০২২ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী মৃদুল দাশগুপ্ত

মৃদুল দাশগুপ্তের জন্ম ১৯৫৫ সালের ৩ এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শ্রীরামপুর-এ। বাবা জ্যোৎস্নাকুমার ও মা সান্ত্বনা, স্ত্রী মাধবী এবং আত্মজা মন্দাক্রান্তা।

শিক্ষা পূর্ণচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ-মাধ্যমিক (বিজ্ঞান শাখা) শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজ থেকে জীবন বিজ্ঞানে সাম্মানিক স্নাতক।

কর্মজীবন সাংবাদিকতা, কর্মস্থল সাপ্তাহিক পরিবর্তন পত্রিকা, দৈনিক সংবাদপত্র যুগান্তর ও আজকাল।

বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থা থেকে কবিতা লেখা শুরু। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'জলপাইকাঠের এসরাজ' (১৯৮৩), 'এ ভাবে কাঁদে না' (১৯৮৬), 'গোপনে হিংসার কথা বলি' (১৯৮৮), 'সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ' (১৯৯৮), 'ধানখেত থেকে' (২০০৭), 'সোনার বুদ্বুদ' (২০১০), 'আগুনের অবাক ফোয়ারা' (২০২০)। ছড়ার বই 'ঝিকিমিকি ঝিরিঝিরি' (১৯৯৭), 'আমপাতা জামপাতা' (১৯৯৯), 'ছড়া ৫০' (২০০১), 'রঙিন ছড়া' (২০০৮), 'খেলাচ্ছড়া' (২০১৭)। গল্পগ্রন্থ 'পার্টি বলেছিল ও সাতটি গল্প' (২০১৯)। এ ছাড়া রয়েছে 'নির্বাচিত কবিতা' (১৯৯৯), 'কবিতা সমগ্র' (২০১৫), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (২০২১)।

মৃদুলের প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কবিতা সহায়' (২০০২), 'সাতপাঁচ' (২০০৯), 'ফুল ফল মফস্‌সল' (দুই খণ্ড, ২০১৮, ২০১৯)।

ইতিমধ্যেই মৃদুল যে-সব পুরস্কারে ভূষিত তার মধ্যে রয়েছে 'ন্যাশনাল রাইটার্স অ্যাওয়ার্ড (১৯৭৪), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির পুরস্কার (২০০০) এবং 'রবীন্দ্র পুরস্কার' (২০১২)। ডাকটিকিট সংগ্রহ তাঁর অন্যতম শখ।

২০২৩ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী দিলীপ ফুকন

দিলীপ ফুকনের জন্ম অসমের গোলাঘাট জেলার এক ছোট্ট গ্রাম কুরুয়াবাহি-তে, ব্রহ্মপুত্র ও ধনসিড়ি নদীর সংযোগস্থলে, এক নান্দনিক পরিবেশে যেখানে সমৃদ্ধ বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির মিলন ঘটেছে।

দিলীপের শিক্ষাগত যোগ্যতা সোসিয়োলজিতে এম.এ.। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর কাব্যজীবন শুরু হয়। বিখ্যাত বাঙালি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অনুসরণে লিখতে থাকেন বৈপ্লবিক ভাবধারার কবিতা। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'বিপ্লব প্লাবন' প্রকাশ পায় ১৯৭১ সালে।

বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সমর্থনে ছাত্র-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন দিলীপ। বাংলার নকশাল আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে লিখতে থাকেন অসমিয়া কবিতা ও গদ্য।

শ্রীফুকন বিভিন্ন কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিহীন ও 'আধিয়ার' চাষিদের আন্দোলন। একই সঙ্গে চলতে থাকে কাব্যচর্চা। তাঁর কবিতা প্রকাশ পায় 'প্রকাশ', 'সাম্প্রতিক সাময়িকী', 'আমার প্রতিনিধি', 'পান্থপাদ প', 'জনমভূমি', 'সাতসরী', 'গরীয়সী' প্রভৃতি বিশিষ্ট অসমিয়া ম্যাগাজিনে।

দিলীপের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চারটি -- 'বিপ্লব প্লাবন' (১৯৭১), 'দৈকলা সান্তোরে জোত' (২০১১), 'দুনাই অগ্নিত আখৈ ফুটে' (২০১৭) এবং 'দৈবাৎ রেহালি দেওহাঁস (২০২২)।

তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা দুই -- 'জ্বল পোদুমর পানচৈ' (২০১৪) এবং 'অস্তি ধানসিড়ি তীরে'। লিখেছেন একটি সমালোচনা গ্রন্থ -- 'কবিতার লালা-কোটা বাট (২০২৩)। এ ছাড়া লিখেছেন লোককথা নিয়ে 'লোকজীবনর মোনোধ্বনি' (২০১১)।

এ-পর্যন্ত যেসব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন দিলীপ তার মধ্যে রয়েছে যোরহাটের সদৌ অসম কবি সম্মেলন প্রদত্ত বর্ষ শ্রেষ্ঠ কবি ২০১৭, গুয়াহাটির বন্ধু-চাকি ন্যাস দ্বারা বন্ধু-চাকি সাহিত্য পুরস্কার ২০২১ এবং গুয়াহাটির নর্থ ইস্ট ফাউন্দেশন প্রদত্ত ধ্রুবজ্যোতি বরা সাহিত্য পুরস্কার।

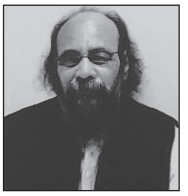

২০২৩ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী জয় গোস্বামী

জয় গোস্বামীর জন্ম ১০ নভেম্বর ১৯৫৪, কলকাতায়। শৈশব থেকে প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয় রানাঘাটে। এখন কলকাতাবাসী।

শিক্ষা - একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। 'দেশ' পত্রিকায় চাকরি করেছেন ১৬ বছর।

আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু-বার— ১৯৯০ এবং ১৯৯৮ সালে। পুরস্কার প্রাপ্তির তালিকায় আছে সাহিত্য অকাদেমি (২০০০), ভারতীয় ভাষা পরিষদ প্রদত্ত রচনাসমগ্র সম্মান। একই বছরে পেয়েছেন আইআইপিএম-এর মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড। ২০১২ সালে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত বঙ্গভূষণ ও বঙ্গবিভূষণ। ২০১৪ সালে মুম্বাই ইন্টারন্যাশনাল লিটারারি ফেস্টিভালে গিয়ে গ্রহণ করেছেন পোয়েট লোরিয়েট-এর শিরোপা। ২০১৫-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২০১৭-তে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছেন সাম্মানিক ডি লিট। ২০১৭ থেকে ২০১৯-এর মধ্যে পেয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড, শরৎ পুরস্কার এবং ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রদত্ত মূর্তিদেবী সম্মান।

২০০১ সালে আমেরিকার আইওয়া আন্তর্জাতিক লেখক শিবিরে আমন্ত্রিত হয়েছেন। ২০০৮ সালে গিয়েছেন মেলবোর্ন ও সিডনিতে। ২০১০ সালে চিন দেশের বেজিং ও সাংহাই-তে কবিতাপাঠ ও আলোচনায় আমন্ত্রিত হয়েছেন।

বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি

সংকলন : রমানাথ ভট্টাচার্য

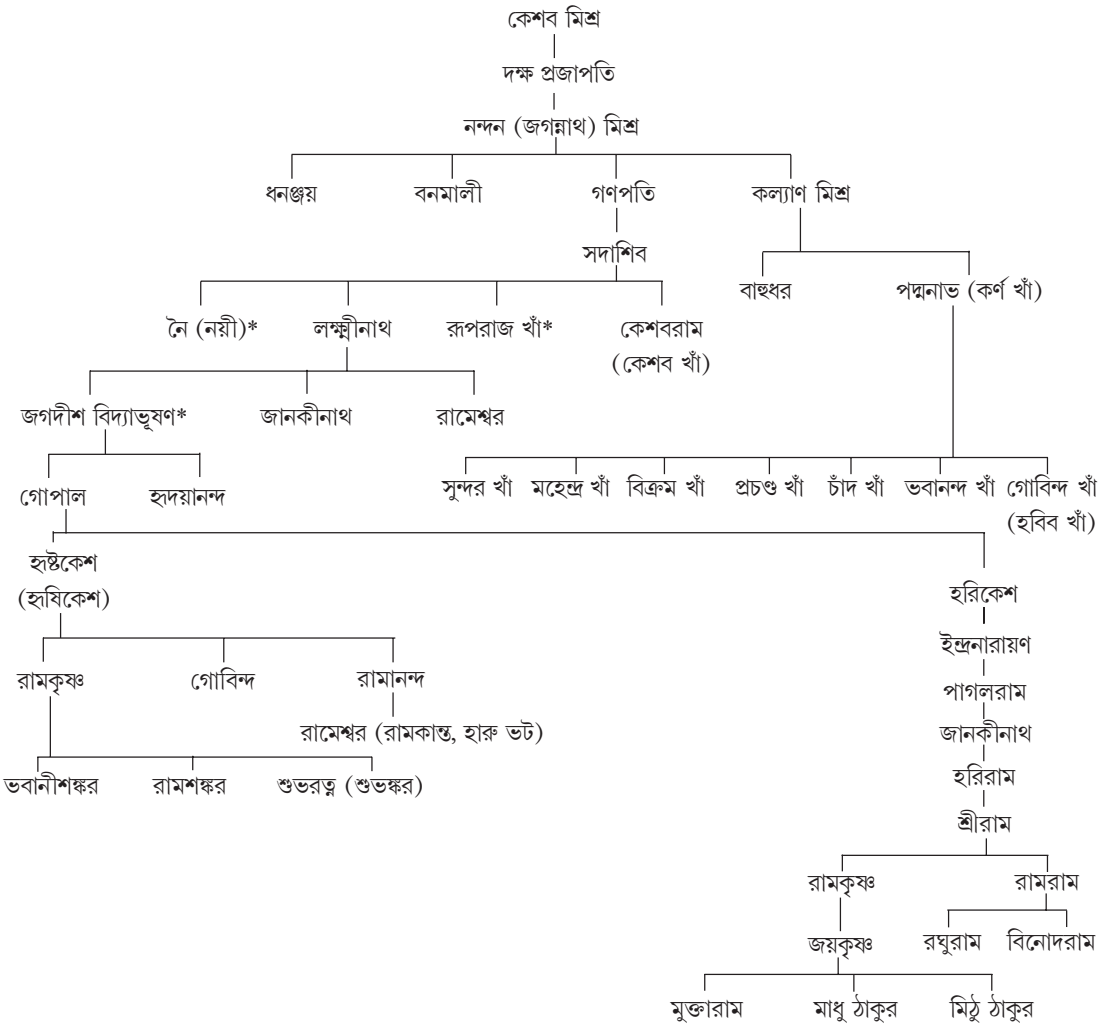

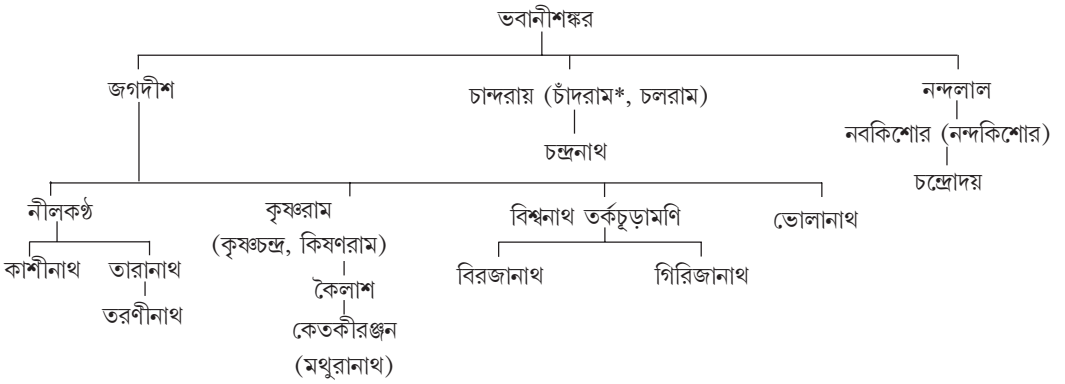
ভবানীশঙ্কর
জগদীশ
চান্দরায় (চাঁদরাম*, চলরাম)
নন্দলাল
চন্দ্রনাথ
নবকিশোর (নন্দকিশোর)
চন্দ্রোদয়
নীলকণ্ঠ
কৃষ্ণরাম
(কৃষ্ণচন্দ্র, কিষণরাম)
বিশ্বনাথ তর্কচূড়ামণি
ভোলানাথ
কাশীনাথ
তারানাথ
তরণীনাথ
কৈলাশ
কেতকীরঞ্জন
(মথুরানাথ)
বিরজানাথ
গিরিজানাথ

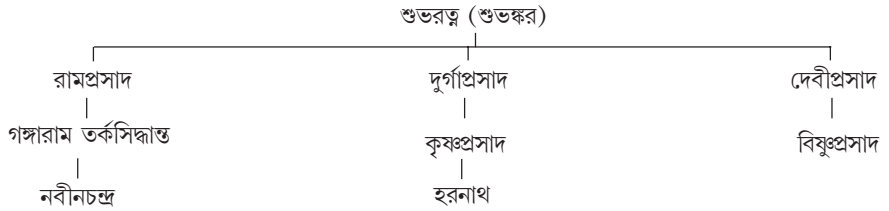
শুভরত্ন (শুভঙ্কর)
রামপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
দেবীপ্রসাদ
গঙ্গারাম তর্কসিদ্ধান্ত
কৃষ্ণপ্রসাদ
বিষ্ণুপ্রসাদ
নবীনচন্দ্র
হরনাথ

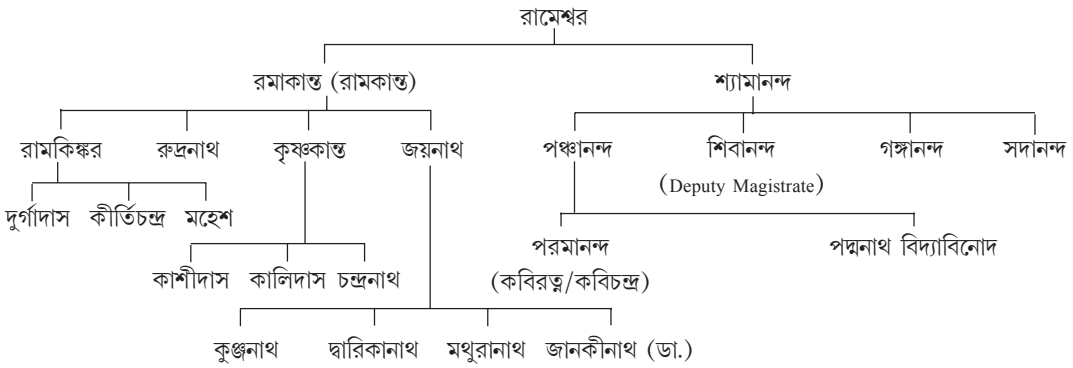
রামেশ্বর
রমাকান্ত (রামকান্ত)
শ্যামানন্দ
রামকিঙ্কর
রুদ্রনাথ
কৃষ্ণকান্ত
জয়নাথ
পঞ্চানন্দ
শিবানন্দ
(Deputy Magistrate)
গঙ্গানন্দ
সদানন্দ
দুর্গাদাস
কীর্তিচন্দ্র
মহেশ
পরমানন্দ
(কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
কাশীদাস
কালিদাস
চন্দ্রনাথ
কুঞ্জনাথ
দ্বারিকানাথ
মথুরানাথ
জানকীনাথ (ডা.)

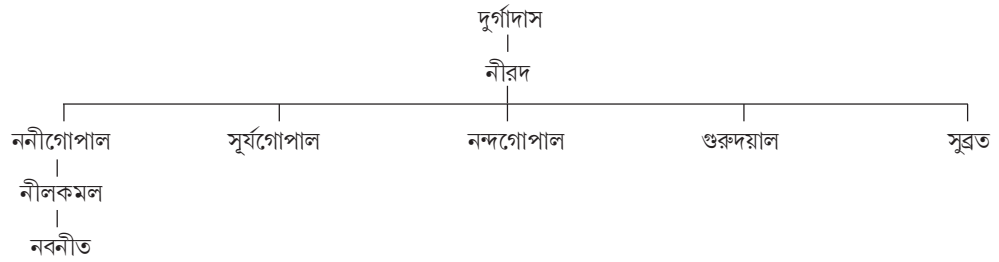
দুর্গাদাস
নীরদ
ননীগোপাল
সূর্যগোপাল
নন্দগোপাল
গুরুদয়াল
সুব্রত
নীলকমল
নবনীত

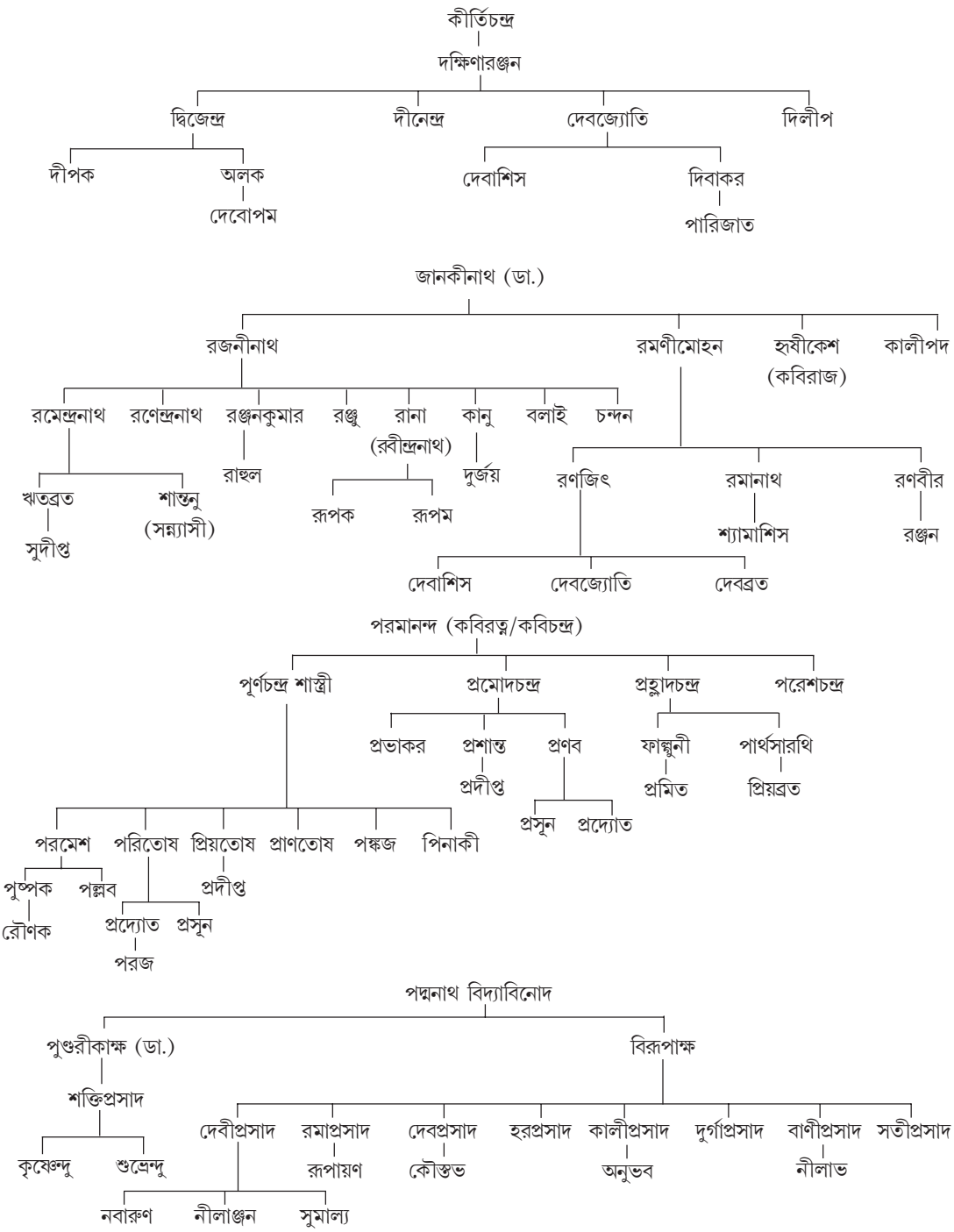
কীর্তিচন্দ্র
দক্ষিণারঞ্জন
দ্বিজেন্দ্র
দীনেন্দ্র
দেবজ্যোতি
দিলীপ
দীপক
অলক
দেবোপম
দেবাশিস
দিবাকর
পারিজাত
জানকীনাথ (ডা.)
রজনীনাথ
রমণীমোহন
হৃষীকেশ (কবিরাজ)
কালীপদ
রমেন্দ্রনাথ
রণেন্দ্রনাথ
রঞ্জনকুমার
রঞ্জু
রানা (রবীন্দ্রনাথ)
কানু
বলাই
চন্দন
ঋতব্রত
শান্তনু (সন্ন্যাসী)
সুদীপ্ত
রাহুল
রূপক
রূপম
দুর্জয়
রণজিৎ
রমানাথ
রণবীর
শ্যামাশিস
রঞ্জন
দেবাশিস
দেবজ্যোতি
দেবব্রত
পরমানন্দ (কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)
পূর্ণচন্দ্র শাস্ত্রী
প্রমোদচন্দ্র
প্রহ্লাদচন্দ্র
পরেশচন্দ্র
প্রভাকর
প্রশান্ত
প্রণব
ফাল্গুনী
পার্থসারথি
প্রদীপ্ত
প্রমিত
প্রিয়ব্রত
প্রসূন
প্রদ্যোত
পরমেশ
পরিতোষ
প্রিয়তোষ
প্রাণতোষ
পঙ্কজ
পিনাকী
পুষ্পক
পল্লব
প্রদীপ্ত
রৌণক
প্রদ্যোত
প্রসূন
পরজ
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
পুণ্ডরীকাক্ষ (ডা.)
বিরূপাক্ষ
শক্তিপ্রসাদ
দেবীপ্রসাদ
রমাপ্রসাদ
দেবপ্রসাদ
হরপ্রসাদ
কালীপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
বাণীপ্রসাদ
সতীপ্রসাদ
কৃষ্ণেন্দু
শুভ্রেন্দু
রূপায়ণ
কৌস্তভ
অনুভব
নীলাভ
নবারুণ
নীলাঞ্জন
সুমাল্য

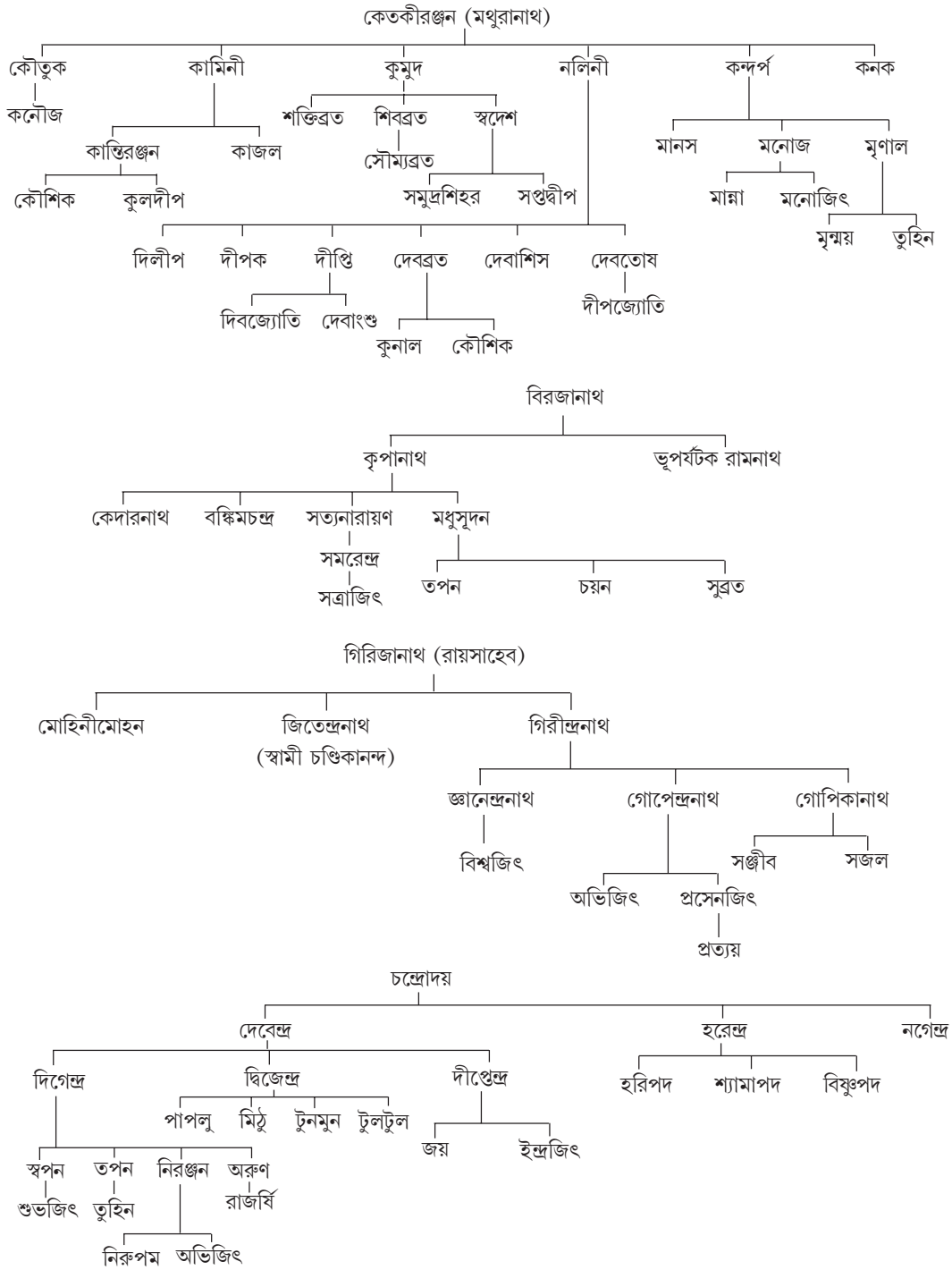
কেতকীরঞ্জন (মথুরানাথ)
কৌতুক
কনৌজ
কামিনী
কান্তিরঞ্জন
কৌশিক
কুলদীপ
কাজল
কুমুদ
শক্তিব্রত
শিবব্রত
সৌম্যব্রত
স্বদেশ
সমুদ্রশিহর
সপ্তদ্বীপ
নলিনী
দিলীপ
দীপক
দীপ্তি
দিবজ্যোতি
দেবাংশু
দেবব্রত
কুনাল
কৌশিক
দেবাশিস
দেবতোষ
দীপজ্যোতি
কন্দর্প
মানস
মনোজ
মান্না
মনোজিৎ
মৃণাল
মৃন্ময়
তুহিন
কনক
বিরজানাথ
কৃপানাথ
ভূপর্যটক রামনাথ
কেদারনাথ
বঙ্কিমচন্দ্র
সত্যনারায়ণ
সমরেন্দ্র
সত্রাজিৎ
মধুসূদন
তপন
চয়ন
সুব্রত
গিরিজানাথ (রায়সাহেব)
মোহিনীমোহন
জিতেন্দ্রনাথ
(স্বামী চণ্ডিকানন্দ)
গিরীন্দ্রনাথ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ
বিশ্বজিৎ
গোপেন্দ্রনাথ
অভিজিৎ
প্রসেনজিৎ
প্রত্যয়
গোপিকানাথ
সঞ্জীব
সজল
চন্দ্রোদয়
দেবেন্দ্র
দিগেন্দ্র
স্বপন
শুভজিৎ
তপন
তুহিন
নিরঞ্জন
নিরুপম
অভিজিৎ
অরুণ
রাজর্ষি
দ্বিজেন্দ্র
পাপলু
মিঠু
টুনমুন
টুলটুল
দীপ্তেন্দ্র
জয়
ইন্দ্রজিৎ
হরেন্দ্র
হরিপদ
শ্যামাপদ
বিষ্ণুপদ
নগেন্দ্র

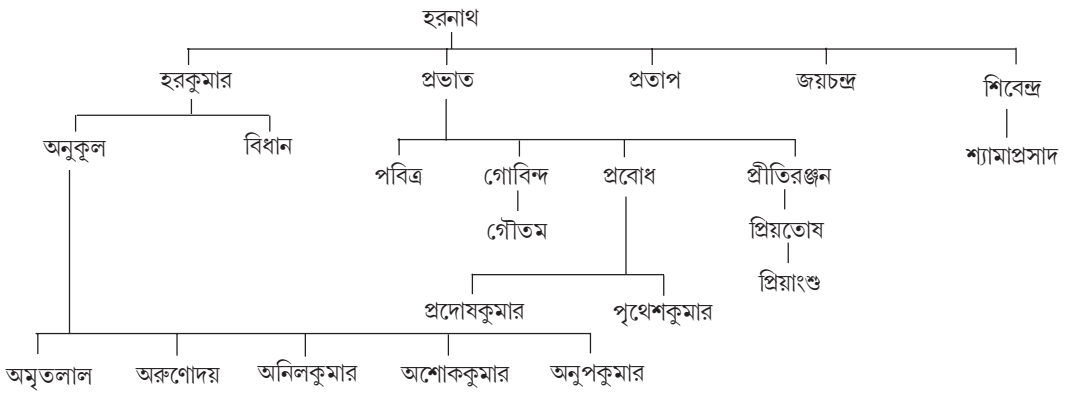

সংকলকের বক্তব্য

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি রচিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০১-৬০২, দ্বিতীয় 'উৎস' সংস্করণ, জুন ২০০৪, ঢাকা) সন্নিবিষ্ট আছে আমাদের মূল কুলপঞ্জি ('বাণিয়াচঙ্গের রাজবংশ')। নতুন কুলপঞ্জিটি নির্মাণে-পুনর্নির্মাণে উক্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কুলপঞ্জি ছাড়াও শ্যামসুন্দর বসুর লেখা ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জীবনীগ্রন্থ 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আংশিক কুলপঞ্জিটিরও সাহায্য নিয়েছি।

পূজনীয় জ্ঞাতি-কাকা স্বর্গত প্রহ্লাদচন্দ্র ভট্টাচার্য সংকলিত অন্য একটি হস্তলিখিত কুলপঞ্জি, যেটি সন্নিবিষ্ট আছে দিল্লিনিবাসী অনুজ জ্ঞাতি ড. প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্যের www.bhattacharyasofsylhet_blogspot.com ওয়েবসাইটে— এ-ব্যাপারে সেটিরও সাহায্য নিয়েছি। এই তিনটি কুলপঞ্জি অধ্যয়ন করে দেখেছি, আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ-কেউ একাধিক নামে পরিচিত ছিলেন। আমি এই কুলপঞ্জিতে তাঁদের প্রতিটি নামই দেখিয়েছি। তবে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে তাঁরা যে-নামে উপস্থিত নন, তাঁদের সেইসব নাম আমি বন্ধনীর ভেতর রেখেছি। কুলপঞ্জিগুলি গভীরভাবে পাঠ করে দেখেছি (পঞ্চদশ শতক থেকে উনিশশো দশ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত), আমাদের কুলপঞ্জি, যেটি 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আছে, সেখানে আমাদের কোনো-কোনো পূর্বপুরুষ ভুলবশত অনুপস্থিত; অনুপস্থিত পূর্বপুরুষ হরিকেশের উত্তরপুরুষরাও। আমার পুনর্নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁরা স্বনামে উপস্থিত।

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জি অনুসারে পূর্বপুরুষ রামকৃষ্ণের ছিল ভবানী, শঙ্কর, রাম ও শুভরত্ন নামে চার পুত্র; কিন্তু প্রাগুক্ত অন্য দুটি কুলপঞ্জি অনুসারে তিনি ছিলেন তিন পুত্রের জনক; পুত্রদের নাম ছিল যথাক্রমে ভবানীশঙ্কর, রামশঙ্কর ও শুভরত্ন (শুভঙ্কর)। এই কুলপঞ্জিতে তাঁরা শেষোক্ত নামেই উপস্থিত। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ 'রমাকান্ত' রামকান্ত নামে উপস্থিত। আসলে তাঁর নয়, তাঁর বাবার অন্য নাম ছিল রামকান্ত। ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিতেও তিনি রমাকান্ত নামেই উপস্থিত। তাঁর উত্তরপুরুষদের কাছেও তিনি ওই নামেই পরিচিত। (রমাকান্তের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অনেকদূর ছড়িয়েছিল। কথিত আছে, বানিয়াচং থেকে সুদূর ঢাকায় তাঁকে যেতে হত মহাভারতের 'বিরাট পর্ব' পাঠের জন্য।)

পারিবারিক ইতিহাস বলে : আমার ঠাকুরদা জানকীনাথের সহোদর মথুরানাথকে দত্তক নিয়েছিলেন তাঁর নিঃসন্তান জ্ঞাতিভাই কৈলাস এবং তাঁর নাম রেখেছিলেন কেতকীরঞ্জন। সে-কারণে এই কুলপঞ্জিতে জানকীনাথের পুরুষানুক্রমে তিনি মথুরানাথ এবং তৎপরবর্তী পুরুষানুক্রমে তিনি কেতকীরঞ্জন (তথা মথুরানাথ) নামে উপস্থিত। 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আমাদের কুলপঞ্জিতে ভুলবশত শ্রদ্ধেয় অগ্রজ জ্ঞাতি 'গোপেন্দ্র' দেবেন্দ্র নামে এবং জ্ঞাতিভাইপো 'তপন' শশাঙ্কশেখর নামে উপস্থিত। আমার নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁদের সঠিক নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কুলপঞ্জিতে আমাদের যেসব পূর্বপুরুষের নাম তারকাচিহ্ন যুক্ত, বানিয়াচঙে এখনও তাঁদের নামে পাড়ার নাম আছে।

এই কুলপঞ্জি নির্মাণে শিলচরনিবাসী আমার অগ্রজ-জ্ঞাতি

শ্রদ্ধাস্পদ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের অবদান অনেক। এই জটিল কাজ সম্পন্ন করার সময় সর্বদা পেয়েছি তাঁর পরামর্শ। এটি নির্মাণে শিলচরবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো স্বদেশ বিশ্বাস ও তপনকুমার বিশ্বাস, শিলংবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অরুণোদয় বিশ্বাস এবং গুয়াহাটিবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অভিজিৎ বিশ্বাসের অবদানও মনে রাখার মতো। কুলপঞ্জিটি নির্মাণে অনুজ জ্ঞাতি রমাপ্রসাদ (সন্তু) ভট্টাচার্যের অবদানও অনস্বীকার্য। তাঁর কাছ থেকেই সন্ধান পেয়েছি ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিটির। এই শুভ কাজে আমার আত্মীয় বিমল গোস্বামী ও তাঁর স্ত্রী পূর্ণা গোস্বামীরও অবদান আছে। এককথায়, বহু আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় পুনর্নির্মিত হয়েছে এই কুলপঞ্জি। আমি এটির সংকলক মাত্র।

পরিশেষে জানাই, কুলপঞ্জিটি ইতিপূর্বে ২০১১ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল, এটিতে আমাদের সেইসব জ্ঞাতিই উপস্থিত যাঁদের আদি বাড়ি ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত বানিয়াচঙের বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। অবশ্য দেশভাগজনিত কারণে কুলপঞ্জিটি ষোলো আনা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কী আর করা যায়!

তবে ২০১৬ সালের জানুআরি মাসে আমাদের পূর্বপুরুষ প্রভাত বিশ্বাসের পৌত্র শ্রী প্রদোষকুমার বিশ্বাস (যিনি বর্তমানে কোচবিহারবাসী এবং সম্পর্কে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র) সহ তাঁর অনুজ পৃথেশকুমার, জ্যাঠতুতো ভাই গৌতম, খুড়তুতো ভাই প্রিয়তোষ ও তস্য পুত্র প্রিয়াংশুর নাম ফাউন্ডেশনের স্মারকগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য এসএমএস করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। শ্রীমান প্রদোষ নিজেই আমার ফোন নম্বর জোগাড় করে যোগাযোগের পথ খুলে দিয়েছেন। এ বড় আহ্লাদের কথা। বলা বাহুল্য, উক্ত তথ্য কুলপঞ্জিতে ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তা ছাড়া, দেশবিভাগ-জনিত কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় আমার স্বর্গত জ্যেষ্ঠতাত রজনীনাথ ভট্টাচার্যের কয়েকজন উত্তরপুরুষের নাম বানিয়াচং রাজবংশের কুলপঞ্জিতে ইতিপূর্বে সন্নিবিষ্ট হয়নি। বানিয়াচং বিদ্যাভূষণপাড়া নিবাসী আমার অনুজ জ্ঞাতি শ্রী শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস ব্যাকরণতীর্থের প্রচেষ্টায় নামগুলি সঠিকভাবে উদ্ধার করা গেছে এবং ২০১৭ সাল থেকে কুলপঞ্জিতে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ❑